আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালার নবম বই

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

[ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ]

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এক টাকা বারো আনা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৪

আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা

১। দিল্লী চলো—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

২। মুক্তি পতাকাতলে—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৩। নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

৪। আরাকান ফ্রণ্টে—শান্তিলাল রায়

৫। বিপ্লবীর আহ্বান—মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

৬। ভারত ছাড়—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

৭। জাপানী বন্দী-শিবিরে—মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৮। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—গোপাল ভৌমিক

৯। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ—ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০। লেখপুঞ্জ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি

১১। জার্মানিতে নেতাজি

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রংমশাল প্রেস লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রাকর—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও। বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি রক্তিম অধ্যায় রচনা করেছেন বাঙ্গালী তরুণ বিপ্লবীরা। একদিন তাঁরা সর্বস্ব পণ করে মরণযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তিল তিল করে নিজেদের জীবনক্ষয় করে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু, আজ তাঁদের অনেকের কথাই আমরা ভুলে গিয়েছি; আধুনিক তরুণদের কাছে তাঁদের নাম পর্যন্ত প্রায় অবলুপ্ত। দেশে বিদেশে ইতিহাসের পাতায় সে কথা আজ পর্যন্ত ভালো করে লেখা হয়নি; রাজভয়, লোকভয়, সংস্কার-ভাবনা ঐতিহাসিকের লেখনীকে এতকাল সঙ্কুচিত করে রেখেছে।

সেদিনকার সেই বিপ্লবান্দোলনের যাঁরা ছিলেন অগ্রগামী পথিক আজ তাঁদের অনেকেই পরলোকে। নীরবে নিভৃতে মুক্তিসাধনা ছিল যাঁদের ব্রত—তাঁরা নিজেদের কর্মকৃতিকে গোপনতার গহ্বর থেকে বাইরে সূর্যালোকে টেনে এনে সর্বজনগোচর করতে কোনদিনই চান নি। তাঁদের সাধনা যখন ইতিহাসের তথ্য হয়ে উঠল তখন তাঁদের মধ্যে যে কয়জন জীবিত, তার ভেতর কেউ কেউ বিক্ষিপ্ত বিচ্যুত স্মৃতিকথার আকারে সেই সব তথ্য ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। নানা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলার দলিলপত্রাদিতে, কিন্তু অধিকাংশই সরকারী গোপন কাগজপত্রে, সেই যুগের সেই স্মরণীয় অথচ অত্যন্ত স্বল্পজ্ঞাত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। হয়ত আরো কিছুদিন সে সব দলিলপত্র ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিছু কিছু বই বা প্রবন্ধের আকারে,

কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসের আকারে বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বাঙালী পাঠকের গোচর করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তা অধিকাংশক্ষেত্রেই আংশিক ও অসম্পূর্ণ; তাছাড়া অর্ধ কল্পনায় মেশানো একধরণের রোমাণ্টিক কল্পনাও এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সময় এসেছে যখন নেতৃস্থানীয় বিপ্লব-কর্মীদের সকলের জীবনকথা যতটুকু জানা যায়, তাঁদের কার্যকলাপ, নীতিনিয়ম, তাঁদের বৈপ্লবিক রীতি-পদ্ধতি, তাঁদের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ সব কিছু সম্বন্ধে যত তথ্য জানা যায় নিষ্ঠার সঙ্গে তা সংগ্রহ করা দরকার।

বাংলার একজন প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান দেশ-কর্মী এবং যতীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী এই কাজে ব্রতী হয়েছেন, ইহা অত্যন্ত সুখ ও আনন্দের বিষয়। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লববাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ নায়ক। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি তাঁর জীবন কাহিনী ও কর্মকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ বর্ণনা; ইতিহাসের তথ্য হিসাবে অমূল্য। এইভাবে টুকরো টুকরো করে তথ্য সংগ্রহ করেই বিপ্লববাদের একটি সমগ্র ইতিহাস রচনা করা সম্ভব; এবং এ চেষ্টা এখন থেকেই যদি আরম্ভ করা না যায় তা হ'লে অনেক তথ্যই বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যাবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তরুণোচিত উৎসাহ নিয়ে যে-কাজটি করলেন তার জন্য তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ (১৬ বৎসর বয়সে

যতীন্দ্রনাথ (২২ বৎসর বয়সে)

পূর্বাভাস

দুর্ভাগ্য অবনত ভারত এতদিনে সত্যই স্বাধীনতার পথে পদার্পণ করিল। ইংরাজ-রাজ ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে স্বাধীনতার অরুণালোক দেখা দিয়াছে। নূতন-দিল্লীতে অন্তর্বর্তী স্বরাজ-শাসনতন্ত্র চলিতেছে। দু'দিন পূর্বে যাহারা ঘোরতর রাজদ্রোহী, বিপ্লবী ও ইংরাজের চক্ষে দেশের দারুণ শত্রু বলিয়া বিদিত ছিল—অদৃষ্টের পরিহাসে তাহারাই আজ রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। দেশের প্রথম প্রত্যক্ষ মুক্তি-সংগ্রাম, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, প্রকাশ্য অসহযোগ আন্দোলন ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত অভিনব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষের পর বর্ষ কতকাল ধরিয়া কত কঠোর পরীক্ষা ও নিদারুণতার মধ্য দিয়া কত বীরহৃদয়ের অসাধারণ শক্তিসাধনা ও আত্মবলিদানে আমাদের চোখের সামনে বাঙ্গলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমবেত চেষ্টায় এক মহান ধারাবাহিক বিপ্লবের সাহায্যে দেশ এই স্বরাজের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। তাহার এই দীর্ঘ নিরন্তর সংগ্রামে দুর্দিনের অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া স্বাধীনতার পথ সুস্পষ্ট হইয়াছে কিনা তাহা এখনও অবশ্য ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক ভারতকে আজ এই মুক্তির পথে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বাংলার যে সকল বীর সন্তান নিজের রক্তদানে ইংরাজের রক্তচক্ষুকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কারা নির্বাসন ও মৃত্যুবরণ করিয়া

বাংলাকে ও সমগ্র ভারতকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে প্রাণপণ করিয়া গিয়াছে—তাহাদের কথাই আজ স্বভাবত মনে আসিতেছে। তাহাদের বিপ্লবের সে প্রথম আহ্বান ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা লাভ না হইলেও তাহাদিগের জীবন-মরণ সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই। তাহাদিগের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের ফলেই দেশে মুক্তির পথ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই পথেই আজ দেশ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। সেই পথ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রত্যেকেই স্মরণীয়, দেশের নমস্য ও বরেণ্য। তাহাদিগের সকলকেই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বাংলার অদ্বিতীয় বীরসন্তান বিপ্লবনেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথাই এই পুস্তকে বিশেষ করিয়া বলিব।

যতীন্দ্রনাথের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কোন কোন কাগজে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাহা খুব সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল। এখন সময় আসিয়াছে—যতীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট প্রকাশিত হওয়া দরকার। যে ইংরাজ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সংগ্রাম করিয়া ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন, যতীন্দ্রনাথও সেই ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংঘ গঠন করিয়া আজীবন সংগ্রাম করিয়া স্বদেশের উদ্ধারের জন্য নিজের জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অসাধারণ কর্মকাহিনী ও সাহসিকতা ভুলিবার নহে। তাহার যথাযথ পরিচয় দেশবাসীর নিকট এখন প্রকাশিত হইবার যোগ্য।

বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই, হয়ত সে সময়ও আসে নাই। সে আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই আজ পরলোকে। যে কয়েকজন

জীবিত আছেন তাঁহাদিগের কেহ কেহ তাঁহাদের স্মৃতিকথা বই বা প্রবন্ধাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সরকারী বিবরণীতেও কিছু কিছু তথ্যাদি জানা যায়। কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান এমন অনেক জিনিষ এখনও অনেকের কাছে অজ্ঞাত। যে সমাজ ও রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ সম্প্রদায় আজ স্বাধীনতা সংস্কারের পুরোগামী সৈনিক, তাঁহারা অনেকে বিপ্লববাদীদিগের কথা হয়ত জানেন—কিন্তু সেই জ্ঞান তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক জ্ঞান নয়, অর্ধ সত্য অর্ধকল্পনায় মিশ্রিত এক রোমাণ্টিক অনুভূতি মাত্র: ঐতিহাসিক তথ্যের অনেকখানি আজও নানা কারণে লোকচক্ষুর গোচর নয়। সরকারী দলিলপত্রে অনেক তথ্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেসব দলিলপত্র আরো কিছুদিন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না। পুস্তক বা প্রবন্ধের আকারে বাঙ্গলার বিপ্লববাদের ইতিহাস কিছু কিছু পাঠক-সাধারণের গোচরে আসিয়াছে; কিন্তু তথ্যের দিক হইতে তাহা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবকর্ম্মীদিগের সকলের জীবনকথাও আমরা ভাল করিয়া জানি না। তাঁহাদিগের কার্যকলাপ, নীতিনিয়ম, বৈপ্লবিক রীতিপন্থা, তাঁহাদিগের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ খুব কমই জানি। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অঘোরপন্থীর ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্বের একজন প্রসিদ্ধ নায়ক। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার জীবনকাহিনীর বিবৃতি ঐতিহাসিক তথ্যপূরণের একটী আংশিক চেষ্টা মাত্র। এইভাবে বিচ্ছিন্ন তথ্য কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াই বাঙ্গলার বিপ্লববাদের একটী সমগ্রতথ্যের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে। সে চেষ্টা এখন হইতেই না করিলে অনেক তথ্য বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তথ্যের অপেক্ষাও প্রয়োজন বিপ্লববাদের জন্ম-বিবরণ,

যে মানসিক আবহাওয়া যে চিন্তাধারা জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের উপর বাঙ্গলার বিপ্লববাদের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। কোন আন্দোলন, রাষ্ট্রীয়ই হউক আর সামাজিকই হউক—সহসা জন্মলাভ করে না। তাহার পিছনে থাকে বহুদিনের মানসিক আলোড়ন, একটী সজাগ ও সজীব চিন্তাধারা একটী জীবনাদর্শ জানিবার সজ্ঞান প্রয়াস। বাঙ্গলাদেশে পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে এই প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারও পূর্বে বাঙ্গলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, পাঞ্জাবের সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, জাঠদিগের সংগ্রাম, মারাঠাদিগের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, মধ্যভারতে তাঁতীয়া তোপীর বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া শাসকসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটী বৈপ্লবিক আবহাওয়া ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সিপাহী-বিদ্রোহের ভিতর দিয়া সেই বৈপ্লবিক আবহাওয়াই একটী প্রচণ্ড ঝড়ের রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তির যে কামনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিলয় ঘটে নাই। সেই আবহাওয়াতেই শুধু বাঙ্গলার নয় ভারতবর্ষের সমস্ত অঘোরপন্থী বিপ্লবীগণ তাঁহাদিগের নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, মারাঠী অঘোরপন্থী বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকারই সর্বপ্রথমে সিপাহী-বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমসাময়িক ইয়োরোপের রাষ্ট্রচিন্তা বিপ্লব ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে স্বাধীনতার স্পৃহা সাধারণভাবে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিতে থাকে এবং দু-একটী প্রতিষ্ঠানের

সূচনাও হইতে থাকে। ইহাদের আশ্রয় করিয়া সাধারণ রাষ্ট্রীয় আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলন অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ধরণেরই একটি প্রতিষ্ঠান কিছুদিন পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে রূপান্তর লাভ করে। অপর দিকে স্বল্পসংখ্যক তরুণের মধ্যে আর একটী মানসিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই গড়িয়া উঠিবার মূলে একদিকে ছিল হিন্দু সংস্কৃতির নূতন চেতনা আর একদিকে ছিল ইয়োরোপীয় বিপ্লবান্দোলনের প্রেরণা, রীতিনীতি ও আদর্শ। ভারতবর্ষের তিনটী প্রদেশ—বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে প্রায় একই সঙ্গে এই মানসিক আবহাওয়া ও নব নব চিন্তা সক্রিয় হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে ও জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।

মহারাষ্ট্রে মারাঠী জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল পুণা। এই আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা। ইহাদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন নানা ফাড়নবিশ এবং পেশোয়ারা—যাঁহাদিগের নিকট হইতে ইংরাজ মারাঠী-স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিল। চিৎপাবনদিগের মধ্যে এই পরাজয়ের গ্লানি চিরদিন সজাগ ছিল এবং সেই গ্লানিরই প্রতিক্রিয়া রূপে তাঁহারা শিবাজীর স্মৃতি ও জীবনাদর্শ সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিবাজীর জীবনাদর্শ ছিল হিন্দু স্বারাজ্য, এবং কৌশলে ও বাহুবলে দ্রুত ও আত্মবিলোপী কর্মপন্থায় সেই স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রবলপ্রত্যপান্বিত ইংরাজের সামরিক বলের বিরুদ্ধে সম্মুখ শস্ত্রবল এযুগে কার্যকর হইবার কথা নয়; বিশেষত এদেশে অস্ত্র-আইন প্রচলিত। কাজেই মারাঠী স্বাধীনতা-কর্মিগণকে অন্য উপায়ের কথা ভাবিতে হইয়াছিল। আর সে উপায়ের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন সমসাময়িক য়ুরোপের

বিপ্লবপন্থার মধ্যে, ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডির ইতিহাসের মধ্যে, রুশীয় বিপ্লবান্দোলনের গোপন কর্মপন্থার মধ্যে। শিবাজীর আদর্শ এবং গোপন বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা লইয়া পুণা, নাসিক, বম্বে ও আহ্‌মদাবাদে ছোট ছোট মেলা বা সমিতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৮৯৩ সাল হইতে এই সকল মেলা বা সমিতিতে প্রকাশ্যে শিবাজী-উৎসব এবং সর্ব্বজনীন গণপতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ছোরা ও তরবারি খেলা, শারীরিক ব্যায়াম, স্বদেশী গ্রহণ, বিলাতি বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, ধর্মোৎসব, মাদক দ্রব্য বর্জন এবং শিবাজী ও গণপতির নামে গোপনতা ও স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ—এইসকলই ছিল এই সকল মেলা ও সমিতির অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু স্বাধীনতার বাধা অপনোদনই ছিল ইঁহাদের আদর্শ। ইঁহাদের মতে, ইংরাজের পরাধীনতাই আমাদের জীবনপথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা; সেইজন্য বিপ্লবী অঘোরপন্থায় সেই বাধা মোচনই ছিল ইঁহাদের ব্রত। এই সময়ে হিন্দু-ভারতবর্ষের যে গরিমাময় ইতিহাস ধীরে ধীরে দেশের সম্মুখে উন্মোচিত হইতেছিল তাহাও এই স্বাধীনতাকর্মী বিপ্লবীদিগকে অনেক পরিমাণে প্রেরণা দিয়াছিল। তাই বহুদিন পর্য্যন্ত এই বিপ্লবীদিগের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল গীতা; এবং তাহার কর্মযোগই তাঁহাদিগের জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়াছিল।

পঞ্জাবে বিপ্লবী আবহাওয়া সৃষ্টির মূলে ছিল স্বামী দয়ানন্দের আর্য-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলনই পাঞ্জাবের তরুণ-সম্প্রদায়ের স্বল্পসংখ্যক লোককে স্বাধীন হিন্দু ভারতের স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিল এবং সমসাময়িক য়ুরোপের বৈপ্লবিক আদর্শ ও রীতিনীতি সেই স্বপ্নে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিয়া নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় রূপান্তর ঘটাইয়াছিল।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

বাঙ্গলা দেশে একদিকে যেমন সমসাময়িক য়ুরোপের বৈপ্লবিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মপন্থা বিস্তারলাভ করিয়াছিল আর একদিকে তেমনই শিখ, মারাঠা, রাজপুত এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা স্বল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা দিতেছিল। তাহার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে। এই হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে বাঙ্গলার বিভিন্ন সহরে ধীরে ধীরে কতকগুলি সমিতি গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মারাঠার ন্যায় বাঙ্গলাতেও সমিতির সভ্যদের অবশ্যপালনীয় ছিল লাঠি, ছোরা ও তরবারি পরিচালনা শিক্ষা, শারীরিক ব্যায়াম, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার, সংঘশক্তির চর্চা, হিন্দু জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় আদর্শের প্রচার এবং গোপনতা, ও স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ। এই সকল কর্মের রীতিনীতি গৃহীত হইয়াছিল সমসাময়িক য়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মপন্থা ও রীতিনীতি হইতে,—বিশেষভাবে ম্যাজিনী-গ্যারিবল্ডির এবং রুশীয় আন্দোলনের ইতিহাস হইতে এবং কতকটা বাঙ্গলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ হইতে। এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করিয়া-ছিলেন। আনন্দমঠ বাংলার বিপ্লবীদল রচনায় ও দলের কল্পনায় অনেক উপাদান প্রদান করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হিন্দুর সাধনা ও সংস্কৃতির যে দিকটা শক্তির ও কর্মের, সমসাময়িক বাঙ্গালী সাধক ও মনীষীরা সেই দিকটা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়াই গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ও বৈদান্তিক জীবন-দর্শন তরুণ বাঙ্গলার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে তাহার প্রথম আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখা যায় এবং তাঁহার প্রধানতম শিষ্য বিবেকানন্দের কর্মের ও প্রচারের মধ্যে

তাহার প্রথম ফল দেখা দেয়। এদেশে শক্তির দেবতা কালী, যিনি দুর্গা বা ভবানীর সংহারিণীমূর্তি—সেই কালীর সাধক ছিলেন বিদ্রোহী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। আনন্দমঠের দেবী কালী, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আরাধ্যাও ছিলেন কালী। বাঙ্গলার বিপ্লবীদিগের আরাধ্যাও ছিলেন এই শক্তিরূপিণী কালী। তাঁহাদিগের মনের মধ্যে দেশরূপিণী মাতা এবং শক্তিরূপিণী কালী উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। কালী যেমন ছিলেন তাঁহাদিগের আরাধ্যা, তেমনই তাঁহাদের পাঠ্য ছিল গীতা—যে গীতার মধ্যে বৈদান্তিক কর্মযোগ শ্রেষ্ঠরূপ লাভ করিয়াছে। শক্তির আরাধনা এবং নিষ্কাম কর্মের আবাহন—এই উভয়ই বাঙ্গলার বিপ্লবীদিগের মানসাকাশ ও জীবনদর্শন রচনা করিয়াছিল। ঘটনাপুঞ্জের সংঘাতে একই মানসাকাশ বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই আকাশ হইতে যাঁহারা নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রহণ করিবার মত যাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক। সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা সংকীর্ণ স্বল্পসংখ্যক লোকের একটী শ্রেণীমাত্র। যে জীবনদর্শন তাঁহাদিগের মানস রচনা করিয়াছিল, সমগ্র জনসাধারণের চিত্ত তাহাতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সহজ বা সম্ভব ছিল না। অর্থনৈতিক বা দৈনন্দিন জীবনগত কোন প্রেরণা তাহার পিছনে ছিল না। এই জীবনদর্শন কঠিন চিন্তাপ্রসূত ও দৃঢ় চরিত্রসাপেক্ষ। ইহার মূল প্রেরণা ছিল হিন্দুর উচ্চস্তরের সাধনা ও সংস্কৃতি। কাজেই নিম্নস্তরের হিন্দুরা ও অগণিত মুসলমানরা সেই সাধনা ও সংস্কৃতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। ইহা ছাড়া অঘোরপন্থী বিপ্লবীগণের কর্মপন্থা ছিল গোপন—অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ। সেইজন্যই রোমান্টিক আকর্ষণ সত্ত্বেও বিপ্লবী-

দিগের জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা কোন সময়েই অধিকসংখ্যক লোককে বিপ্লবের পথে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই কিংবা গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা না পারিলেও এই জীবনদর্শন ও জীবন-চর্যার মধ্যে এমন একটী কঠোর আদর্শ ও প্রতিজ্ঞা ছিল, যাহা বিপ্লবীদিগের চরিত্রকে এক অপরূপ সমৃদ্ধি দান করিয়াছিল। শক্তির সাধনা এবং বৈদান্তিক নিষ্কাম কর্মযোগ তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও সেবার, বীর্য ও নির্ভীকতার, নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের, আত্ম-বিনাশ ও আত্ম বিলোপের এবং সর্বোপরি মানব-মহিমার এক অপূর্ব বিকাশ ঘটাইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের জীবন এই সাক্ষ্যই বহন করে। বাঙ্গলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা কোনও ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক উত্তেজনা বা উচ্ছৃঙ্খল উদ্যম মাত্র নহে। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হইবার যে ইচ্ছা, তাহা সমগ্র জাতির মনে স্বভাবতই জাগিয়া থাকে, আর তাহা বাঙ্গালী জাতির মনে বহুদিন পূর্বেই জাগিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সে ইচ্ছা রূপলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে সেই জাতীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তির ছায়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। পণ্ডিত যোগেন্দ্র-নাথ বিদ্যাভূষণ আর্যদর্শনে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়া ম্যাজিনী গ্যারিবল্ডি রাণা প্রতাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণের জীবনী লিখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে বিশিষ্ট চিন্তাধারা আনিয়াছিলেন, বাঙ্গলার বিপ্লববাদ তাহারই উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা একদিন জাতির মনে ও চিন্তাধারায় আভাসে-ইঙ্গিতে গোধূলি আবছায়ার মতো দেখা দিতেছিল, যাহা একদিন কেবলমাত্র সন্ন্যাসধর্মের মধ্য দিয়া দেশসেবায় সীমাবদ্ধ ছিল—সেই মাতৃপূজা কেবলমাত্র দেশমাতৃকার স্তবস্তুতি ছাড়িয়া তাঁহার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে বিপ্লবের প্রচেষ্টায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। বাঙ্গলাতে

এই স্বাধীনতার ইচ্ছা ও দেশসেবা শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনায় বিপ্লবের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল ও বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সকল দিকেই এই বিপ্লব অপ্রতিহত গতিতে প্রসারিত হইতেছিল। পরে ইহা সন্ত্রাস বা সশস্ত্রপথে আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজের কঠোর শাসনাধীন দেশের মধ্যে থাকিয়া অল্পাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে যতীন্দ্রনাথকে যে বিপ্লব-সংগ্রাম গুপ্ত ও অপ্রকাশ্যভাবে পরিচালিত করিতে হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র দেশের বাহিরে গিয়া সেই সংগ্রাম প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় ইহা অহিংস রূপ লইয়া অগ্রসর হইলেও দেশে এই একই বিপ্লব-প্রচেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে ও নানা দিক দিয়া তাহারই ফলে বৈদেশিক শাসনশক্তি আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কোনও দেশই বিনাসংগ্রামে ও বিনা আন্দোলনে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভের পথে আসিয়াছে, ইহাও সেই সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে। সকল দেশেই স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে এবং তাহার কোনও এক স্তরে সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশেও তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে ছুটিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ায় তরুণ বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় আঘাত লাগিতেছিল। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের পর হইতেই বাঙ্গলার তরুণদিগের জীবনে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং ক্রমশ তাহা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; সে পথের কঠোরতা ও

নানা বিঘ্ন দেখিয়া সন্ত্রাসবাদী, আন্দোলনের কর্মপন্থাও পরিবর্তিত হইয়াছিল। দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাও নূতন কর্মপন্থায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গলায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই ক্রম পরির্তন ও পরিণতির রূপটী বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষ আজ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করিয়া গণ-আন্দোলনের পথ ধরিয়াছে। ১৯২১ সাল হইতেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এই পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতীন্দ্রনাথের জীবন এই ক্রম-পরিণতির ও বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সন্ধিস্থলে একটী মূল গ্রন্থিস্বরূপ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসাধন করিতেছে।

সেকালে বাঙ্গলার ও সারা ভারতের সাধারণ রাজনীতি একমাত্র কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোনরূপ সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত করা তখনকার সাধারণ দেশ-নেতাদের কল্পনার বাহিরে ও দেশবাসীর নিকট, বিশেষত বাঙ্গলার নিকট—সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। তবুও বুদ্ধিপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিকে বাঙ্গলার শক্তিকে ও জাতীয় উন্নতিকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্যেই বড়লাট লর্ড কার্জন আসিয়া ভবিষ্যতের ভয়ে নানা ছলে ও কৌশলে ইংরাজের কূট রাজনীতির অনুসরণে বাঙ্গলাকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে বসিলেন। তাহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একজন বাঙ্গালী যুবক উপাধ্যায় নাম লইয়া বরদার ষ্টেটে সেনা-বিভাগে ভর্তি হইয়া সৈন্যের কাজ করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও ঐ সময় তাঁহার সুদীর্ঘ ইংলণ্ড-প্রবাসের পর বরোদাতে আসিয়া বরোদার রাজ-কলেজে সহকারী অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বরোদা হইতে বাঙ্গলায় প্রথম সশস্ত্র-বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বাণী লইয়া

আসেন। তিনি বলেন বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া উঠিয়াছে ও কার্য করিতেছে; তাহারা শীঘ্রই ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, বাঙ্গলাই শুধু সে ভারতব্যাপী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া আছে; বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য বাঙ্গলার তরুণ-শক্তির অবিলম্বে জাগিয়া উঠিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ শীঘ্রই বাঙ্গলাতে আসিয়া দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ নির্দেশ করিবেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা হইতে আসিয়া তখন বাঙ্গলার দেশ-প্রেমিকদের নিকট ইহাই প্রথম প্রকাশ করেন।

ইহার পূর্ব্বে বম্বে ও পুণায় বালগঙ্গাধর তিলক স্বাধীনতার প্রথম পুরোহিত স্বরূপ দেশমুক্তির মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ইং ১৮৯৫ সাল হইতেই সেখানে মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়ক শিবাজির স্মৃতিপূজা ও উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। পুণার চিৎপাবন ব্রাহ্মণ দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় "হিন্দুধর্মের বিঘ্ন অপসারণ সমিতি" স্থাপন করিয়া দৈহিক উন্নতি ও সামরিক শিক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে বম্বে অঞ্চলে প্লেগ মহামারী আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ প্লেগের প্রতিষেধক যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাতে সেখানে সাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার হইতে থাকে। তিলক নিজেও একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার 'কেশরী' কাগজে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্লেগ-প্রতিকারের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন ও ১৮৯৭ সালের জুন মাসে শিবাজী উৎসবের সভাপতিরূপে উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দেন। ঐ জুন মাসের ২২শে তারিখে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজত্বের জুবিলী উৎসব হয়। বম্বের প্লেগ

কমিশনার Rand সাহেব ও Lieutenant Ayerst সাহেব বম্বের লাট-ভবন হইতে ঐ উৎসবের পর রাত্রিতে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। বম্বেতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার যে প্রস্তরমূর্তি ছিল দামোদর চাপেকার তাহাতে আলকাতরা মাখাইয়া তাহা কদাকার করিয়া দিয়াছিলেন। Rand ও Ayerstএর হত্যার জন্য দামোদর চাপেকারের প্রাণদণ্ড হয় এবং তিলকের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও 'কেশরী'তে লেখার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড হয়। শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে বলিয়া অন্য একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ১৮৯৮ সালে 'কাল' বলিয়া একখানি মারাঠি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন; তাহাতে রাজদ্রোহ-মূলক লেখার জন্য তিনিও দণ্ডিত হন। বৈদেশিক শাসনশক্তির প্রভাবে পুণার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কেও অকস্মাৎ নির্বাসিত হইয়া যাইতে হইল। এই সকল ঘটনা-পরম্পরা লইয়া তৎকালে কলিকাতা টাউনহলে যে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হইয়াছিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে উদ্দীপনাময় সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ভারতের ও বাঙ্গলার বিপ্লব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরউজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ১৯০৫ সালে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা বলিয়া একব্যক্তি বম্বে হইতে লণ্ডনে গিয়া সেখানে India Home Rule Society (ভারত স্বায়ত্তশাসন সমিতি) গঠন করেন ও সেখানে তাহার সভ্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে নাসিক নিবাসী বিনায়ক দামোদর সাভারকার নামক বাইশ বৎসরের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-যুবক (ফারগুসন কলেজের ছাত্র ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.) লণ্ডনের ঐ Home Rule Societyর সভ্য হন। ১৯০৬ সালে পুণার ছাত্রগণ একটি সমিতি গঠন করিয়া বিনায়ক সাভারকারকে তাহার সভাপতি

করেন। বিনায়ক সাভারকার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে স্কুলে তাঁহার ছাত্রজীবনের প্রতিষ্ঠিত 'মিত্র-মেলাকে' অভিনব ভারত (Young India) সমিতিতে পরিণত করেন। বিলাতে গিয়া সাভারকার প্যারিস হইতে কুড়িটি Browning Automatic Pistol বম্বে পাঠাইয়া দেন। তাহার পরই নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট Jackson সাহেব গণেশ সাভারকারকে কারাদণ্ড দেওয়ায় নিহত হন ও নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা হয়। সাভারকার প্যারিসে যাইবার পূর্বে লণ্ডনে তৎকালীন ভারত-সচিব Lord Morleyর A. D. C. Sir Curzon Wyllie এক ভারতবাসীর গুলিতে নিহত হন। ঐ হত্যার জন্য সাভারকারের একজন সঙ্গী মদনলাল ধিংড়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। লণ্ডনস্থিত ভারতবাসিগণ এই হত্যার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ-সভা করিয়া সর্ববাদী-সম্মত বলিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিতে গেলে—সভার মধ্যে সাভারকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন, ইহা সর্ববাদীসম্মত নহে—তিনি ঐ মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। এই প্রতিবাদের জন্য সাভারকারকে ঐ সভায় গুরুতর রকম আহত হইতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে Extradition Case হয়। তাঁহাকে জাহাজে লইয়া আসিবার সময় মার্শেলে আসিয়া তিনি অতি বিস্ময়কররূপে জাহাজের স্নানের ঘরের ছিদ্রপথ দিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া পলায়ন করেন এবং প্রহরীদিগের গুলিবর্ষণের মধ্যে ডুব দিয়া ও সাঁতরাইয়া ফরাসী-উপকূলে গিয়া উঠেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তাঁহাকে চৌদ্দ বৎসর আন্দামানে নির্বাসিত অবস্থায় থাকিতে হয় ও পরে রত্নগিরিতে রাজবন্দীরূপে জীবনের আরো চৌদ্দ বৎসর কাটাইতে হয়। এই সকল ঘটনা হইতে দেখা যায়, বোম্বাই প্রদেশই সশস্ত্র বিপ্লবধর্মে প্রথম দীক্ষিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গলার আগেই বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশে ১৯০৭ সাল হইতে পূর্বাপর বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়। পাঞ্জাবে লাহোরের রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের প্ররোচনায় অমৃতসরে ও ফিরোজপুরে নূতন বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, লায়ালপুর প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চলিতেছিল এবং ইয়োরোপীয়গণকে অসম্মান ও অপমান করা হইতেছিল। চিনাব-কেনাল প্রদেশে ও বারি দোয়াবে ভূমিসম্বন্ধীয় আইন ও জমির করবৃদ্ধি লইয়া শিখদিগের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। শিখসৈন্য ও পুলিশগণকে ইংরাজরাজের চাকরী ছাড়িয়া দিবার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি নানাস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে থাকে। এই সকলের প্রতিকার জন্য হিন্দু নেতা লালা লাজপৎ রায়কে ও শিখনেতা অজিত সিংহকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে নির্বাসিত করা হয় এবং ভাই পরমানন্দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনানুসারে মোকদ্দমা হয় ও তাঁহার বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গ না করার আদেশ হয়। ১৯০৭ সালে ভাই পরমানন্দ ইংলণ্ড থাকাকালে লালা লাজপৎ রায় লাহোর হইতে তাঁহাকে দু'খানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠি দু'খানি ও আলিপুর বোমার মোকদ্দমার আসামীগণ যে প্রণালীতে বোমা প্রস্তুত করিত সেইরূপ বোমা প্রস্তুতের নিয়মাবলী তাঁহার নিকট পাওয়া গিয়াছিল। লাজপৎ রায় তাঁহার ঐ চিঠিতে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা—যিনি লণ্ডনে গিয়া India Home Rule Society স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এদেশের লেখক, সাংবাদিক ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে আমেরিকা ও বিলাতে গিয়া শিক্ষিত হইয়া ভারতবাসিগণকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতে পারেন তাহার জন্য অনেক টাকার

বৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট লাহোরের ছাত্রগণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পুস্তকের ও অর্থসাহায্যের জন্য ভাই পরমানন্দকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল। ইহার পূর্বেই হরদয়াল নামক পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির একজন হিন্দু ছাত্র ১৯০৫ সালে States Scholarship লইয়া Oxfordএ পড়িতে যান কিন্তু ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধী হইয়া Scholarship পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ও ইংরাজ শাসনের অবসান জন্য লাহোরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলেন। তিনিই পুনরায় আমেরিকাতে গিয়া বিদ্রোহীদলের প্রতিষ্ঠা করেন।

যুক্তপ্রদেশে ১৯০৭ সালে শান্তিনারায়ণ নামক একজন সম্পাদক কর্তৃক 'স্বরাজ্য' বলিয়া সংবাদপত্রের স্থাপনা হইতেই বৈদেশিক ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ঘোষিত হইতে থাকে। ক্রমান্বয়ে নানা বিদ্রোহমূলক প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য শান্তিনারায়ণের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। তাহার পর নূতন নূতন সম্পাদক আসিয়া ঐ 'স্বরাজ্য' কাগজকে বিপ্লবের পথে চালাইতে থাকেন। তাঁহাদিগেরও পর পর কারাদণ্ড হয়। ঐ সকল সম্পাদকগণের মধ্যে সাতজন সম্পাদক পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছিলেন। 'কর্মযোগীন' বলিয়া ঐরূপ আর এক খানি সংবাদপত্র এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আইনের কবলে পড়িয়া ১৯১০ সালে ঐ দু'খানি কাগজই বন্ধ হইয়া যায়। কাশীতে বাঙ্গালীটোলার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯০৮ সাল হইতে 'যুবকগণকে লইয়া 'অনুশীলন সমিতি ও তরুণ সংঘ' বলিয়া দল গঠন করেন। বাঙ্গলার বিপ্লবীগণ কাশীতে গিয়া ঐ তরুণ বিপ্লবীদলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শচীন্দ্র-

যতীন্দ্রনাথ, ইন্দুবালা (সহধর্ম্মিনী), জ্যেষ্ঠপুত্র তেজেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠ কন্যা
আশালতা ও জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়ী বিনোদবালা
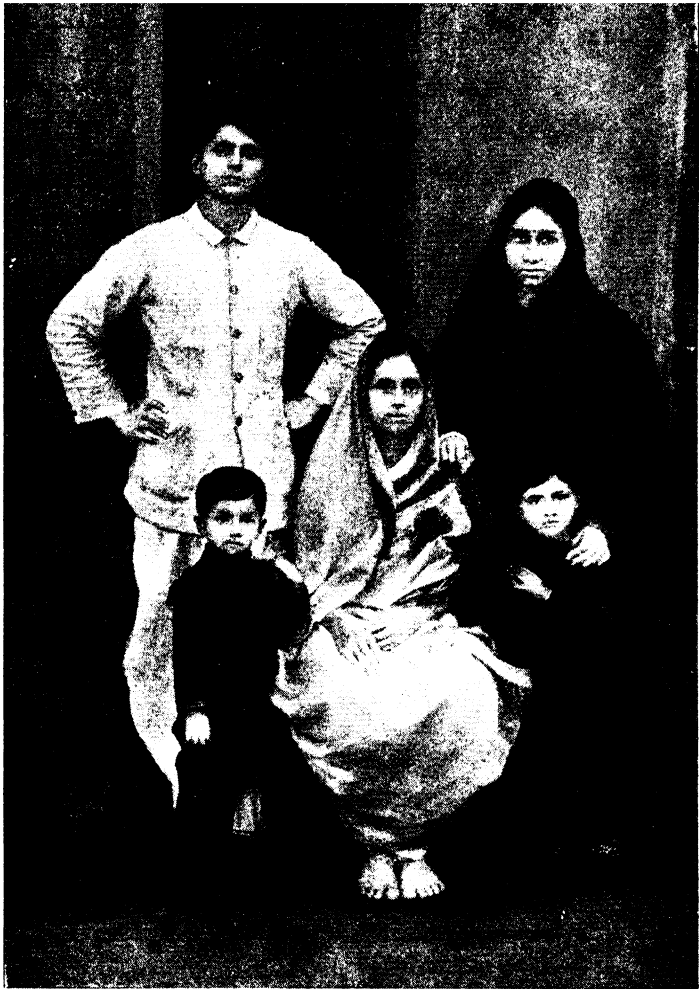
উপবিষ্ট—(বাম হইতে) যতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা (গ্রন্থকার), যতীন্দ্রনাথ

সান্যালের সহিত কাশীতে যতীন্দ্রনাথেরও পরিচয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে মারিবার জন্য দিল্লীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর দেরাডুন Forest Research Instituteএর হেড-ক্লার্ক রাসবিহারী বসু কিছুকাল নিরুদ্দেশ থাকিয়া কাশীতে আসিয়া বাঙ্গালীটোলায় অবাধে গুপ্তভাবে থাকিয়া কাশীর এই বিপ্লব-সমিতিকে বোমা ও রিভলভার ছুড়িবার প্রণালী শিখাইয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি নিজেও একদিন আহত হইয়াছিলেন। তিনি কাশীতে থাকিবার সময় বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামক পুণার একজন তরুণ মারাঠা আমেরিকা হইতে কলিকাতা ফিরিয়া পরে কাশীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমেরিকার গদর দলের চারি হাজার শিখ এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে আরও কুড়ি হাজার শিখ আসিয়া এবং কলিকাতা হইতে পনের হাজার লোক আসিয়া বিদ্রোহে যোগদান করিবে। রাসবিহারী এ সম্বন্ধে কি করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য শচীন্দ্র সান্যালকে পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দেন। ইহারা বিদ্রোহ করা স্থির করিয়া তাহার দিন-স্থির অবধি করিয়াছিলেন। একটি সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার উপযুক্ত দশটি বোমা টিনের বাক্সে লইয়া পিংলে মীরাটে বারো জন অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবার একটি স্থানে ধরা পড়িয়া যান। লাহোর ষড়-যন্ত্রের মোকদ্দমায় তাঁহার ফাঁসী হয়। অতঃপর রাসবিহারী বসু তাঁহার বন্ধু-অনুচরদিগের সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লবের কাজ চালাইয়া যাইবার উপদেশ দিয়া ভারতের বাহিরে চলিয়া যান।

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন্দ্র সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই মোকদ্দমার এপ্রুভার সরকারী সাক্ষী বিভূতি

পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল তদনুসারে চন্দননগরের সুরেশবাবু নামক একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়া অনেকগুলি দোনলা বন্দুক, দোনলা একস্‌প্রেস রাইফেল, ছ'নলা রিভলভার ও কার্তুজ গুলি-বারুদ ছোরা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল। বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামীগণ সকলেই হিন্দু ও একজন ব্যতীত সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালী হিন্দু যুবকের এই দেশাত্মবোধ ও বৈপ্লবিক মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই বাঙ্গলাকে শক্তিহীন ও বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য ও কল্পনা লইয়া লর্ড কার্জন পূর্ব হইতেই তাঁহার কার্যপ্রণালী স্থির করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি কলিকাতায় শ্যামপুকুরে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রথম অবস্থান করেন। ঐ সময়ে ঐ বাটীতে যতীন্দ্রনাথের ছোটমামার সহিত শ্রীঅরবিন্দের ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে থাকিয়া কলিকাতার নানাস্থানে তাঁহার বিপ্লবের বাণী গোপনে প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার নানা স্থানে গোপন সমিতি ও ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠে। ক্রমশ ইহা বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ নানা সমিতি অল্পদিনের মধ্যে গড়িয়া উঠে। মূল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া শারীরিক ব্যায়াম-চর্চাই ঐ সকল সমিতির বাহ্যিক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহার ফলে দেশের তরুণ শক্তি কর্মঠ হইয়া উঠিতে

ছিল। শ্রীঅরবিন্দকে নেতৃত্বের আসনে বসাইয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে ঐ সকল সমিতি কাজ করিতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ঐ একই সময়ে বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়া কর্মিদল সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবের কার্য আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের মুরারীপুকুর বাগানবাটী বিপ্লবীদিগের কর্মকেন্দ্র হয়। 'ভবানী মন্দির' পুস্তকে লিখিত প্রণালীতে বারীন্দ্রকুমার তাঁহাদিগের এই বাগানবাটীতে বিপ্লবপন্থীদিগের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে নবাগত বিপ্লবীদের ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত ও বিপ্লবের পথে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। এই আশ্রমে যাঁহারা ছিলেন—সকলকেই রান্না প্রভৃতি নিজেদের কাজ নিজেদেরই করিয়া লইতে হইত। এই আশ্রমের কর্মিগণ, কি বালক কি যুবা—সকলেই কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন ও সকলেরই মনপ্রাণ এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত ও নূতন স্বপ্নে দোলায়মান হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই আশ্রম ও উহার কাজ অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

গুপ্ত-সমিতি যে ভাবে কাজ করিয়া থাকে তাহা অবলম্বন না করায় ও আবশ্যক অভিজ্ঞতার অভাবে সর্ব বিষয়ে সতর্কতা না থাকায় পুলিশ শীঘ্রই এই আশ্রম ও গুপ্ত-সমিতির সন্ধান পাইল ও একদিন সদলবলে আসিয়া আশ্রম ঘেরাও করিয়া বিপ্লবী-দল ধরিয়া লইয়া গেল। ঐ আশ্রমে বিপ্লবীদিগের নানা অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও পুলীশের বিরুদ্ধে কেহই কোন বাধা প্রদান করিল না। পুলীশের হানায় ভোর-রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গায় সকলেই নিরীহ ভাবে পুলীশের নিকট আত্মসমর্পণ করিল ও পুলিশ-ইনসপেক্টর রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়া বসিল। বারীন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মিগণ খুব নির্ভীক ভাবে

পুলীশের নিকট নিজ নিজ উক্তি করিয়াছিলেন ও যথাযথ সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। বারীন্দ্রই বিপ্লবের বাণী বাঙ্গলায় প্রথম প্রচার করেন বলিয়া পুলীশের নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বারীন্দ্রকুমার বাঙ্গলার বিপ্লবের একজন প্রধান ও প্রথম কর্মী ছিলেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিপ্লবের বাণী বাঙ্গলায় প্রথম আনিয়াছিলেন। এই সময়ে এই আখ্যায়িকার নায়ক যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার ছোট মামা ঐ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাঙ্গলার বিপ্লব-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যান্য তরুণবন্ধুগণকেও এই বিপ্লবের দলে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধু মুরারীপুকুর বাগান-বাটীতে খানতল্লাসীর রাত্রিতে থাকিবার জন্য পুলীশ কর্তৃক ধৃত হন। যতীন্দ্রনাথ ঐ রাত্রিতে তাঁহাব এক মামাতো ভাইয়ের বিবাহে যাওয়ায় সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়াই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহিত ধৃত হন নাই। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির পর যতীন্দ্রনাথই বাংলাব বিপ্লব-ক্ষেত্র কর্মময় রাখিয়াছিলেন ও যে বহ্নি শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্র প্রভৃতি জ্বালাইয়া গিয়াছিলেন তাহা নির্বাপিত হইতে দেন নাই।

প্রথম জীবন

শৈশবেই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া সূচিত হইয়া থাকে। তাই যতীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের কথা আলোচনা করিবার পূর্বে সংক্ষেপে তাঁহার শৈশব-জীবনের পরিচয় দিব। পারিবারিক ঘটনাদি সহ তাহার কোনও বিস্তৃত জীবনী লেখা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে ; তাই ইহাতে সবিশেষ কিছু লিখিত হইল না। তাঁহার বৈপ্লবিক জীবনের দিকটাই বিশেষ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিব। ইং ১৯০৪ হইতে ১৯১৫ অবধি বাঙ্গলায় যে বিপ্লব চলিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের সহিত অনেক পরিমাণে জড়িত বলিয়া আবশ্যক মত তাহারও উল্লেখ কবিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলার সে বিপ্লবের আনুপূর্বিক ইতিহাস লেখাও এই আখ্যায়িকাব উদ্দেশ্য নহে, তাই তাহাবও অনেক কথা ইহাতে অনুক্ত রহিল।

যতীন্দ্রনাথ ইং ১৮৮০ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার কয়াগ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় রিসখালি গ্রামে। তাঁহার পিতা ছিলেন উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শৈশবে পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া যতীন্দ্রনাথ মাতুলালয়ে মানুষ হন ও শিক্ষালাভ করেন। কয়ার চট্টোপাধ্যায়েরা তাঁহার মাতুল বংশ। ঐ বংশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উদার মনোবৃত্তির প্রভাব তাঁহার জীবনকে বহু পরিমাণে গঠিত করিয়াছিল। বঙ্গবিচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে কয়ার চট্টোপাধ্যায়-পরিবার ঐ আন্দোলন

ও বর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন। তাঁহাদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের লইয়া যে সকল মহিলা-সভা হইয়াছে ও রাখী-বন্ধন প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানে বাড়ীর মেয়েরা উদ্দীপনাপূর্ণ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের এক নূতন অভূতপূর্ব কাহিনী। তাঁহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের তরুণ-দিগের বৃহৎ সম্মেলনে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার তরুণ বন্ধুদিগের সাহায্যে যে কাজকর্ম হইয়াছে তাহাও বলিবার বিষয়। বাঙ্গলার স্বাধীনতার ইতিহাস সঙ্কলনে কয়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কথা স্থান পাইবার যোগ্য। যতীন্দ্রনাথের বাসস্থান বলিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ পুলিশ কর্মচারি-গণ একাধিকবার বাংলার বিপ্লব সংশ্রবে কয়া পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের বড় মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে একজন প্রধান উকিল ছিলেন। তাঁহার নিকট থাকিয়া যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল হইতে ১৮৯৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ছেলেবেলা হইতে যতীন্দ্রনাথ খুব সাহসী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে যখন স্কুলে পড়িতেন, সেখানকার বাবু বারাণসী রায় উকিলের একটি ঘোড়া একদিন ছাড়া পাইয়া সহরের রাস্তায় ছুটিয়া খুব বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহই ঐ ঘোড়া ধরিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথ বাজারের রাস্তার উপর নদীয়া-ট্রেডিং-কোম্পানীর দোকানে কাগজ-পেন্সিল কিনিতে গিয়া-ছিলেন। সেখান দিয়া ঐ ঘোড়া ছুটিয়া যাইতেই যতীন্দ্রনাথ নিমেষের মধ্যে দোকানের রোয়াক হইতে রাস্তায় ঐ ধাবমান

ঘোড়ার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, ও ঘোড়ার কাঁধের চুল ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিলেন। কয়াতে তাঁহার ন-মামার 'সুন্দরী' নামে একটি সাদা রং-এর আরবজাতীয় সুশ্রী ঘোটকী ছিল। যতীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ন-মামার নিকটে ঐ ঘোড়ায় চড়া ও তাঁহার বন্দুক-চালনা অভ্যাস করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট মামার নিকট সাঁতার শিখিয়াছিলেন। তিনি সাঁতার দিয়া নির্ভয়ে গড়ুই নদী পার হইতেন ও তাহাতে নৌকা চালান শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর এবং কয়ায় থাকিতেই তিনি খেলাধুলা, পথ-হাঁটা, পরিশ্রম করা ও কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার পর যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিয়া তাঁহার মেজমামা ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শোভাবাজারের বাসায় থাকিয়া তখনকার সেণ্ট্রাল কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উপার্জনক্ষম হইবার ইচ্ছায় এফ. এ. পরীক্ষা না দিয়া সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তাঁহার ছোটমামা তাঁহাকে কলিকাতার কুস্তিগীর অম্বু গুহের পুত্র ক্ষেত্রনাথ গুহের কুস্তির আখড়ায় ভর্তি করিয়া দেন। সেখানে কুস্তি শিখিয়া যতীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য পুনরায় ভাল হইয়া যায় ও তিনি যথেষ্ট শারীরিক বল অর্জন করেন। যতীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ভালরূপ সর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শিখিয়া চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে Amhuty Co. নামক কলিকাতার এক ইংরাজ সওদাগর অফিসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কার্য আরম্ভ করেন। তাহার পর মজঃফরপুর গিয়া ৮০৲ টাকা বেতনে সেখানকার ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হন। ইহার কিছুদিন

পরেই বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে অধিক বেতনে কাজ পান, ও পুনরায় কলিকাতা আসেন। এই কার্য করিবার সময় হইতেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সঙ্কল্প লইয়া কুড়ি বৎসর বয়স হইতে তাঁহার স্বদেশী রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। এই চাকুরী করিবার সময় হইতেই তিনি কোথায় আলো, কোথায় পথ—তাহারই সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন, ও বাংলার তৎকালীন বিপ্লবপন্থীদিগের দলভুক্ত হইয়া স্বদেশের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অন্যদেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, নানা ধর্মগ্রন্থ ও গীতা পড়িয়া তাঁহার চিত্তকে স্থির ও শক্তিমান করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য নিয়মিত ভাবে গীতা পড়িতেন। বিপ্লবই যে দেশের মুক্তি আনিয়া দিবে সেই বিশ্বাসকে মনে দৃঢ় করিয়া স্থান দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইং ১৯০৬ সালে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বেই তাঁহার মা মারা গিয়াছিলেন। পরোপকারে, গৃহকর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার মা ছিলেন আদর্শ হিন্দু নারী। মা'র মৃত্যুর পর যতীন্দ্রনাথের দিদিই তাঁহার গৃহে তাঁহার মা'র অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করার সময়ে যতীন্দ্রনাথকে কলিকাতা এবং দার্জিলিং উভয় স্থানেই থাকিতে হইত। দার্জিলিং-এ থাকিবার সময়ে তাঁহার দিদি বিনোদবালা দেবী, স্ত্রী ইন্দুবালা, ও পুত্র-কন্যা সকলেই তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি স্নেহময় পিতা ও কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন। তিনি শিশুর ন্যায় সরলস্বভাব, সদা-প্রফুল্ল ও হাস্য-কৌতুকময় ছিলেন। স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কেবলমাত্র পারিবারিক আনন্দসুখে দিন না কাটাইয়া যতীন্দ্রনাথ অফিসের কার্যের সময় ছাড়া সকালে ও সন্ধ্যায় নিজের বাসায় গীতা পড়ানোর ক্লাস খুলিয়াছিলেন। তরুণ বালকদিগকে

আহ্বান করিয়া গীতার মূলমন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিতেন, যাহাতে তাহারা দেশের কাজে সকল স্বার্থত্যাগ করিয়া ও সকল ভয়ের অতীত হইয়া নিজেদের নিয়োগ করিতে পারে, এবং সংখ্যায় অল্প হইলেও বলহীন না হইয়া অত্যাচারীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। এই ভাবে প্রথম হইতেই যতীন্দ্রনাথ বাসায় অনেক সঙ্গী ও অনুচর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তাহাদের সকলের 'বড়দা' বা 'যতীনদা' —আর তাঁহার দিদি বিনোদবালা ছিলেন সকলের 'দিদি'। দিদির স্নেহ, সহানুভূতি ও উদারতায় তরুণ ভাইরা তাঁহার অনুগত ও পরস্পর স্নেহাবদ্ধ হইয়াছিল। গীতা ছাড়া তাহাদিগের সকলকে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্‌ডীর জীবনচরিত ও আত্মত্যাগ বিষয়ক নানা পুস্তক, বিবেকানন্দের লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য বৈদেশিক বিপ্লবের ইতিহাস পড়ান হইত। যতীন্দ্রনাথের উপদেশ ও কথা তাহারা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিত। দেশসেবাকে তাহারা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া শিখিয়াছিল; আর সেই জ্ঞানেই জীবনে কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করিতে অভ্যাস করিত। ভীরু, দুর্বল হইয়া অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করাকে তাহারা প্রাণহীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিত, এবং সর্বদাই আপন আপন অন্তরে পূর্ণ প্রাণশক্তি অনুভব করিত। দেশমুক্তির স্বেচ্ছাসেনা রূপে তাহাদের অনেকেই মা, বাবা, বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের এমন মনের বল ও স্বার্থশূন্য প্রকৃতি ছিল যে তাহাদের প্রত্যেকেরই কার্য ও জীবনী সম্বন্ধে এক একটী কাহিনী লেখা যায়।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গ-বিভাগ ঘোষিত হয়। ঐ সময় হইতে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহারই ফলে আনন্দমঠের

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-রূপে গৃহীত হয়। ১৯০৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলক বাঙ্গলায় আসেন। এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান ও তাহার কার্য পরিদর্শন করেন। তিলক বাঙ্গলায় আসিবার পর বাংলার সকল স্থানেই বৎসর বৎসর শিবাজী-উৎসব হইতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ এই শিবাজী-উৎসবে ব্রিটীশপণ্য বর্জন-আন্দোলনে যে উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে কলিকাতা কাশীপুরের ললিতমোহন দাস বলিয়া একজন দেশপ্রেমিক কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ-স্থলের নিকট তৎকালীন আলফ্রেড থিয়েটারে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ করিয়া শিবাজীর তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার একটী অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একখানি কোষমুক্ত অসি একটি মঞ্চের উপর রাখিয়া তাহা ফুল দিয়া সাজান হইয়াছিল। প্রজ্বলিত আলোকে তাহা অসাধারণ দীপ্তি পাইতেছিল। যাঁহারা এই পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমুক্তিকামী তাঁহারা সেই অসিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেশমুক্তির আন্তরিক কামনা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ঐ অনুষ্ঠানটী আহূত ও ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সরলা দেবী চৌধুরাণীর ঐ অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হইবার কথা ছিল। ঐ রূপ অনুষ্ঠান তখন কলিকাতায় অভিনব বলিলেও হয়। উহাতে যোগদান বৈদেশিক শাসনকর্তাদের প্রীতিকর হইত না; এবং ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলে সেখানেই পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় অনেকেই সেখানে যাইতেন না। যাঁহার সভানেত্রীত্ব করিবার কথা, যে কারণেই হোক তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যতীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অসির উপাসক রূপে তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অনুষ্ঠানটীর

সম্মানরক্ষা ও সফলতা সাধন করিয়াছিলেন। যে অল্পসংখ্যক সন্তান সেখানে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ এই বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করিলে একমাত্র শক্তির উপাসনা দ্বারাই সে কামনা পূর্ণ হইবে এবং ঐ অসিই সে শক্তির প্রতীক। ভারত ও বঙ্গ-জননীর সন্তান মাত্রেরই শক্তির পূজা করা উচিত।

যতীন্দ্রনাথ একবার দার্জিলিং যাইতেছিলেন। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাটফরমে তিনি এক গেলাস জল লইয়া আসিতে ছিলেন। ঐ সময় অপর দিক হইতে চারিজন গোরাসৈন্য পাশাপাশি আসিতেছিল। তাহারা যতীন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অকারণে ধাক্কা দেওয়ায় তাঁহার হাতের কাচের গ্লাসটী পড়িয়া ভাঙিয়া যায়। দুর্বল বাঙ্গালী চিরকালই শ্বেতাঙ্গের এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। অত্যাচার সহ্য করার অর্থই অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া। যতীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে এই অপমান সহ্য হইল না। তিনি গোরাসৈন্য ক'টীর ঐ ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় তাহারা উদ্ধত হইয়া চারিজন একসঙ্গে যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে। যতীন্দ্রনাথও তাহাদিগকে প্রতি-আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষেই ঘুষাঘুষি ও মারামারি হয়। সৈন্যদিগের একজন পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া যতীন্দ্রনাথকে আঘাত করে। ইহা সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ একা খালি হাতে ঐ চারিজন গোরা সৈন্যকে মারিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শায়িত করিয়া দিয়াছিলেন। গোরা সৈন্যগণ মার খাইয়া যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে মোকর্দমা শুরু করিয়া—যে কারণেই হোক তাহা শেষ পর্যন্ত চালায় নাই।

কলিকাতার রাস্তায় যতীন্দ্রনাথকে অনেকসময়ে শ্বেতাঙ্গ

সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে,* কিন্তু তিনি কখন নিজে হইতে কোন বিবাদ করেন নাই বা আগে কাহাকেও আঘাত করেন নাই। একদিন এক ফেরিওয়ালা চানাচুর ফেরি করিতেছিল। রাস্তায় দশ বৎসরের একটী বাঙ্গালী ছেলে খেলা করিতে করিতে চানাচুরওয়ালার সহিত ধাক্কা খাওয়ায় চানাচুর মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে। চানাচুরওয়ালা তাহাতে রাগিয়া ছেলেটীকে ধরিয়া মারে ও পীড়ন করিতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ ঐ সময় সেদিক দিয়া যাইতে যাইতে তাহা দেখিলেন, ও ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। চানাচুরওয়ালার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার মূল্য স্বরূপ তাহারই কথামত তাহাকে পাঁচটী টাকাও দিলেন। চানাচুর-ওয়ালা তবুও ছেলেটীকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় যতীন্দ্রনাথ তাহার সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন; একটী শ্বেতাঙ্গ সেখানে আসিয়া চানাচুরওয়ালার পক্ষ হইয়া যতীন্দ্রনাথকে দোষারোপ করিতে থাকায় যতীন্দ্রনাথ চানাচুরওয়ালার হাত হইতে ছেলেটীকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লন। তাহাতে সাহেব যতীন্দ্রনাথের উপর বল প্রকাশ করিতে যাওয়ায় যতীন্দ্রনাথ তাহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়া প্রতিশোধ লইলেন, এবং তাহাকে মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দিলেন, শ্বেতাঙ্গের শক্তি অপেক্ষা বাঙ্গালীর শক্তি কোন অংশে কম নহে। শুধু মানসিক বলের অভাবেই বাঙ্গালীকে হীন হইয়া থাকিতে হয়।

যতীন্দ্রনাথের মানসিক ও শারীরিক বলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও দু-একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি একবার রাঁচি হইতে হাজারিবাগ অবধি সত্তর মাইল পথ একটানা হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের করোনেশন উপলক্ষে কলিকাতায় যে আলো দেওয়া হইয়াছিল তাহা দেখিতে রাস্তায় লোকের ভীষণ ভিড়

হইয়াছিল। অনেক ভদ্র-মহিলা গাড়ি করিয়া ঐ আলো দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়ে একখানি ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে কয়েকটী মহিলা ও ঐ গাড়ির ছাতে বাড়ির পুরুষছেলেরা বসিয়া আলো দেখিতেছিল। কয়েকটি কাবুলিওয়ালা আসিয়া কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ গাড়ির ছাতে উঠিয়া সেখান হইতে পুরুষছেলেদের নামাইয়া দিয়া জোর করিয়া সেখানে বসিল। তাহাদের কাবুলি-জুতাপরা পা গাড়ির জানালায় মেয়েদের মুখের সামনে ঝুলিতে লাগিল। যাহাদের গাড়ি তাহারা কোন প্রতিবাদ না করিয়া ভয়ে রাস্তায় নামিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, ও করুণদৃষ্টিতে পাশের লোকদিগের দিকে চাহিতে লাগিল। সেখানে বহু লোক থাকা সত্ত্বেও কেহ ইহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া তামাসাই দেখিতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথও ঐ স্থানে তখন ঘটনাটি দেখিতেছিলেন। তিনি নির্বিকার থাকিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার একজন সঙ্গী ঐ গাড়ীর উপরে উঠিলেন ও কাবুলিওয়ালাদের চোখ-রাঙানিতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া তাহাদিগকে গাড়ির উপর হইতে নীচে নামাইয়া দিলেন। গাড়ির মালিকেরা যতীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যাহাদের নিজের আত্মরক্ষা করিবার কোন শক্তি নাই, ঘরের মেয়েদের লইয়া তাহাদের পক্ষে গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।

যতীন্দ্রনাথ একবার কুষ্টিয়ার খেয়াঘাট পার হইয়া কয়া যাইতেছিলেন। খেয়ানৌকা হইতে নামিয়া দেখেন, একটী দরিদ্র বৃদ্ধা মুসলমান নারী মাথায় ঘাসের বোঝা তুলিয়া দিবার জন্য অনেককেই বলিতেছে ও তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু

কেহই তাহা ধরিয়া তাহার মাথায় উঠাইয়া দিল না; বৃদ্ধার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সকলেই চলিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোথায় যাইবে? সেখান হইতে এক মাইল দূরে তাহার বাড়ি। সে সকাল হইতে ঐ ঘাস কাটিয়াছে; ঐ ঘাস লইয়া গিয়া তাহার গরুকে খাওয়াইবে। ঐ গরুর দুধ বিক্রয় করিয়া তাহার দিনাতিপাত হয়। যতীন্দ্রনাথ ঘাসের বোঝাটি বৃদ্ধার মাথায় তুলিয়া দিতে গিয়া দেখিলেন—উহা বেশ ভারি; বৃদ্ধার পক্ষে তাহা এক মাইল পথ লইয়া যাওয়া কষ্টকর। ঐ ঘাসের বোঝা বৃদ্ধার মাথায় না চাপাইয়া যতীন্দ্রনাথ তাহা নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন ও বৃদ্ধার বাড়ি পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধাকে কিছু অর্থ-সাহায্যও করিলেন। যতীন্দ্রনাথের মন একদিকে যেমন কঠিন, অপর দিকে তেমনি কোমল ও করুণায় পূর্ণ ছিল। বহু দীনদুঃখী অনাথ ও অসমর্থ ব্যক্তিকে তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তিনি অন্যের অজ্ঞাতে কত দান করিয়াছেন; কত পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়াছেন, বিপদে-আপদে, অসময়ে কতজনের সহায় হইয়াছেন! সর্বপ্রকারে আর্তের উপকার করাই ছিল তাঁহার ধর্ম।

যতীন্দ্রনাথের মামার বাড়ী দুর্গোৎসব হইত। তাহাতে বহু লোককে খাওয়ান হইত। তজ্জন্য পূজার তিনদিন প্রত্যহ দশমণ চাউলের ভাত রান্না করা হইত। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সমবয়সী ও বন্ধুদের লইয়া রান্না-বাড়ীতে লম্বা চূলা কাটিয়া প্রতিদিন ঐ ভাত রান্না করিয়া দিতেন, এবং উপস্থিত লোকদিগকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। যতীন্দ্রনাথ মজঃফরপুরে চাকুরী করিবার সময়ে সেখানে খেলাধূলায় অনেক ভাল ভাল কাপ প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

সেগুলি অনেকদিন অবধি বাড়িতে সাজান ছিল। Long Jump, High Jumpএ ও দৌড়াইতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

কয়ার সন্নিকটে এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের এক মামাতো ভাই ফণিভূষণ বন্দুক লইয়া ঐ বাঘ মারিতে যান। যতীন্দ্রনাথ সেদিন কয়ায় উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সঙ্গে গেলেন। তাঁহার নিকট বন্দুক ছিল না। একেবারে খালি হাতে না গিয়া আবশুক মতো আত্মরক্ষার্থে যতীন্দ্রনাথ একখানি ভোজালি হাতে করিয়া গিয়াছিলেন। দিনের বেলা মাঠের মাঝখানে এক জঙ্গলে যেখানে বাঘ ছিল বলিয়া অনুমান—সেখানে সঙ্গের লোকজন বাঘকে জঙ্গল হইতে বাহির করিবার জন্য জঙ্গলে ঢিল ও লাঠি মারিতেছিল। জঙ্গলের অপর দিক হইতে বাঘ বাহির হইয়া পড়িল। যতীন্দ্রনাথ সেই দিকেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। বাঘ ছুটিয়া বাহির হইতেই ফণিভূষণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি ছুড়িলেন। ঐ গুলি বাঘের মাথার চামড়ার উপর-অংশটি মাত্র ঘর্ষণ করিয়া গেল, বাঘ তাহাতে আহত না হইয়া আরো উত্তেজিত হইয়া যতীন্দ্র-নাথের উপর আসিয়া পড়িল। বিপদে পলায়ন করা যতীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ছিল না—তাই তিনি সরিয়া না গিয়া বাঘের গলা তাঁহার বাম বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাঘের মাথায় ভোজালি দিয়া মারিতে লাগিলেন। বাঘ আহত হইয়া যতীন্দ্রনাথকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাঁহার সহিত বাঘের রীতিমত লড়াই আরম্ভ হইল। অবশেষে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঘ সেই অবসরে তাঁহার দুই হাঁটুতে কামড়াইয়া ও সর্বাঙ্গে নখ বসাইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। তিনি নিজের দেহের আঘাত অগ্রাহ্য করিয়াও বাঘকে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া ছোরার আঘাতে বাঘকে

মারিয়া ফেলিলেন, কিন্তু নিজেও মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তুলিয়া বাড়ী আনা হইল, ও কলিকাতায় তাঁহার মেজমামার নিকট পাঠান হইল। সেখানে বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁহার চিকিৎসা করিয়া বাঘের কামড়ের ক্ষত ও বিষ হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। তাঁহার দু'খানা পা-ই কাটিয়া ফেলিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা করিতে হয় নাই। তিনি ছ-মাস ধরিয়া শয্যাগত ছিলেন এবং ভাল হইয়াও বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে স্ক্রাচের সাহায্যে চলিতে হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার মারা ঐ বাঘের চামড়াখানি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার জীবনদাতা ডাক্তার সর্বাধিকারীকে উপহার দিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি Mr Wheeler ও Mr Omally সাহেবের বিশ্বস্ত স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তাঁহার কর্ম-দক্ষতায় তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। বাঘের কামড়ে আহত হইয়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতেও তাঁহার চাকুরী যায় নাই। তিনি হাওড়া ডাকাতি মামলায় আসামী হইবার পর তাঁহার ঐ চাকুরী যায়। ঐ মামলা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কন্‌ট্রাক্‌টরি কাজ করিতেন ও ঝিনাইদহে থাকিতেন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি একদিন রাত্রে দু'ধারে বনের মধ্য দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে বন্দুক ছিল। পথের মধ্যে একস্থানে হঠাৎ ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয়ই কোন বাঘ অথবা অন্য কোন জন্তু নিকটেই আছে। একটু অপেক্ষা করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখের পথের একধারে একটী বাঘিনী তাহার তিনটী বাচ্ছা লইয়া খেলা করিতেছে।

যতীন্দ্রনাথ (১৬ বৎসর বয়সে)

যতীন্দ্রনাথ (১৫ বৎসর বয়সে)

যতীন্দ্রনাথ গায়ের কোট খুলিয়া ঘোঁড়ার মাথার উপর দিয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিলেন ও তাহাকে আস্তে আস্তে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। পরে বাঘিনীর নিকটবর্তী হইয়া ঘোড়ার উপর হইতেই গুলি করিয়া তাহাকে মারিলেন। তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া বাঘিনীর ঐ বাচ্ছা তিনটাকে ধরিয়া তাঁহার ঝিনাইদহের বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার এই সাহসিকতা ও ছোরা দিয়া বাঘ মারার জন্য দেশের জনসাধারণ তাঁহাকে 'বাঘা যতীন'—এই আখ্যা দিয়াছিল। সামর্থ্যে ও প্রকৃতিতে তিনি সত্যই বাঘের ন্যায় ছিলেন।

বৈপ্লবিক সংগ্রাম

শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত প্রণালীতে বিপ্লবের কার্য চলিতে থাকা কালে বঙ্গ-বিভাগের জন্য দেশে যে আন্দোলনের শুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করিল। একদিকে হাটে-বাজারে গিয়া বিলাতি কাপড় পোড়াইয়া দেওয়া, বিলাতি নুন ফেলিয়া দেওয়া, বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার না করার জন্য প্রচার করা ও তাহার জন্য সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা করা যেমন চলিতে লাগিল, অপর দিকে পুলিশ কর্তৃক ধরপাকড় ও দেশের লোকের জেলে যাওয়াও আরম্ভ হইয়া গেল। বারীন্দ্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদলের 'যুগান্তর' কাগজ পূর্ব হইতেই ইংরাজ-শাসকের বিরুদ্ধে অনল উদ্গীরণ করিতেছিল। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবীদিগের কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে, কি করিয়া শক্তির উপাসনা করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য ব্রত লইয়া বিশ্বজননী ভবানী-শক্তির পূজা দ্বারা কি করিয়া দেশোদ্ধার হইবে ও দেশে কি করিয়া রাজনৈতিক নব-শক্তি উপাসকদলের প্রতিষ্ঠানসকল প্রচলন করিতে হইবে 'ভবানী-মন্দির' বই লিখিয়া তাহা প্রচার করিয়া ও 'বন্দেমাতরম্' নামক ইংরাজি দৈনিক কাগজের সম্পাদকতা করিয়া এবং বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়া দেশবাসীকে জাগরিত করিতেছিলেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইতে হইলে শক্তির সাধনাই যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন,—জাপান তাহার ধর্ম হইতেই সে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল এবং ভারতবাসীকে তাহাই করিতে হইবে, দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে কোন

সুদূর নিভৃত স্থানে মন্দির স্থাপনা করিয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দল গঠন করিতে হইবে, যাহারা দেশে বিপ্লবের কর্মপন্থা প্রস্তুত করিয়া দিবে—'ভবানী-মন্দির' পুস্তকে এই সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'সন্ধ্যা' কাগজে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেমের ও প্রচার-শক্তির পরিচয় দিতেছিলেন। 'স্বরাজ' 'নবশক্তি' 'কর্মযোগিন' প্রভৃতি কাগজও দেশ-সেবায় নূতন আদর্শ ও ভাব প্রচার করিতেছিল। এই কাগজগুলির সহিত যতীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগ ছিল। যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্তিত বিপ্লবপন্থী তাহা নহে, তবে গবর্নমেণ্টের ধরপাকড় ও অত্যাচারের ফলে দেশময় এক বিশাল বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই আন্দোলনের ভিতর যতীন্দ্রনাথ দেশসেবায় বিশেষ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও এই সুযোগে বিপ্লবীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন।

স্বদেশী-আন্দোলন বিনষ্ট করিবার জন্য পুলীশের ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী বাড়িয়া গেল। ইংরাজ গবর্নমেণ্ট বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনের আশ্রয় লইয়া নির্বাসনে সরাইয়া দিলেন এবং অনেকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপরাধের মোকর্দমা করিলেন। কলিকাতার পুলীশ-ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেব ঐ সকল মোকর্দমার বিচার করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে দণ্ড দিয়া, বিশেষত একটি স্বদেশী তরুণ বালককে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়া দেশবাসীর ও বিপ্লবীগণের বিশেষ অপ্রিয় হইয়া পড়েন। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া মজঃফরপুরে জজ হইয়া চলিয়া যান। বিপ্লবীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কৌশলে পুস্তকের মধ্যে

নূতন রকমের বোমা পুরিয়া তাঁহার নিকট ঐ পুস্তক পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিল। কিংসফোর্ড সাহেব ঐ পুস্তকের পার্শেল না খুলিয়াই তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী—যতীন্দ্রনাথের অনুগত ও বিশ্বস্ত দু'টি বালক কিংসফোর্ড সাহেবকে মারিবার জন্য বোমা সহ মজঃফরপুর গিয়াছিল। সেখানকার ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা একাগাড়ি করিয়া কিংসফোর্ড সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়া বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন। ঐ গাড়ি কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ি ও তাহাতে কিংসফোর্ড সাহেবই আছেন মনে করিয়া ভুল করিয়া ঐ গাড়িতে বোমা ফেলায় মিসেস ও মিস কেনেডি বোমার আঘাতে মারা যান। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে এই ঘটনা হয়। ঐ ঘটনার পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দু'জনেই ধরা পড়ে। প্রফুল্ল ধরা পড়িয়াই নিজের পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামের বিচার হইয়া ফাঁসী হয়। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া যে পুলীশ সাব-ইনস্পেক্টর তাহাদিগকে ধরিয়াছিলেন, তিনি ঐ সনের ৯ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতার সারপেনটাইন লেনে বিপ্লবীর গুলিতে মারা যান।

মজঃফরপুরে বোমার ঘটনায় পূর্বে ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে বিপ্লবীদল নারায়ণগড়ে (মেদিনীপুর) বাঙ্গলার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের স্পেশাল ট্রেন বোমা দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ বোমা ফাটিয়া শুধু ট্রেনের এঞ্জিনখানি জখম হইয়াছিল, রাজপুরুষের কোন ক্ষতি হয় নাই। অপরাধীগণকে ধরিবার জন্য গবর্নমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার ফলে জনকয়েক রেলের কুলিকে ধরিয়া বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্বীকারোক্তির

পর এ দেশের পুলীশের তদন্ত-কার্য ও তদনুসারে বিচার যে কৃত মিথ্যার উপর পরিচালিত হয়, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে শিবপুরে ডাকাতি হইয়াছিল ও চন্দননগরের মেয়রের প্রতি বোমা-নিক্ষেপ হইয়াছিল। তাহার পরই ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের ঐ ঘটনা। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে পুলীস এই বিপ্লবীদের বিষয় প্রথম অবগত হয় ও তাহাদের সন্ধান পায়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাস হইতেই বিপ্লবীদের প্রধানকেন্দ্র ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়ি ও তাহাদিগের অন্যান্য থাকিবার স্থান—১৫নং গোপীমোহন দত্তের লেন, ১৩৪নং হ্যারিসন রোড, ২৩নং স্কটস্ লেন, ৩৮।৪নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট—সর্বত্র পুলীশ লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুরের ঐ হত্যাকাণ্ডের পর কলিকাতার সমস্ত পুলীশ কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া বিপ্লবীদিগকে আর অগ্রসর হইতে না দেওয়া স্থির করে। তদনুসারে ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীগণের আশ্রম ও কর্মকেন্দ্র মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়ি সশস্ত্র পুলীশ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও খানাতল্লাসি হইল। খানাতল্লাসিতে ঐ বাগানবাড়ি হইতে বোমা, ডিনামাইট, কার্তুজ, বোমা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি, বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার ও অনেক চিঠি-কাগজপত্র আবিষ্কৃত হইয়া পুলীসের হস্তগত হইল এবং বারীন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মিগণ—স্বনামধন্য উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বিপ্লবীরা একসঙ্গে ধৃত হইলেন। বারীন্দ্র ।ার পুলীশের নিকট এক নির্ভীক স্বীকারোক্তি করেন; তাহাতে কি

করিয়া এই বিপ্লবের আরম্ভ, হয় ও কি তাহার কর্মপন্থা—সকল কথাই তিনি ফাঁস করিয়া দিলেন। এই সংস্রবে নেতৃস্থানীয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও ধৃত হন এবং ইন্দ্রনাথ নন্দী ইন্দুভূষণ প্রভৃতি মোট আটত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা নামে বিখ্যাত রাজনৈতিক মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ও ঋষিচরিত্র মনীষী বর্তমান যুগে বিরল। বারীন্দ্রকুমার তাঁহার ছোট ভাই; তিনিই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাঁহার সহকর্মিগণকে একত্রিত করিয়াছিলেন। দেশে একদিন না একদিন সশস্ত্র বিদ্রোহ হইবেই, তাহা অনিবার্য—এই বিশ্বাসে তিনি অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের উদ্দেশ্য-সাধন,, লোকমত সংগঠন ও বিপ্লবের প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনার জন্য বারীন্দ্রকুমার তাহার দুই বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্যে ১৯০৬ সালের ৩রা মার্চ হইতে 'যুগান্তর' কাগজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবব্রত বসু ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যুগান্তরের প্রধান লেখক ও পরিচালক ছিলেন এবং বিপ্লব-আশ্রমের শিক্ষক ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগান্তরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যুগান্তরে প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ একত্রে চয়ন করিয়া তিনি ১৯০৭ সালে 'মুক্তি কোন পথে' নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রেপ্তার হইয়া সহকর্মিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় যুগান্তরের ন্যায় 'নবশক্তি' নামক অন্য একখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করিবার তাঁহার যে কল্পনা ছিল, তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। হেমচন্দ্র দাস ১৯০৬ সালে প্যারিসে গিয়া বিস্ফোরক

প্রস্তুত করা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন ও এই বিপ্লবীদলভুক্ত হন। উল্লাসকর দত্ত আপনা হইতেই বিস্ফোরক প্রস্তুত করা শিখিয়াছিলেন ও তাহা প্রস্তুত করিতেন। শৈলেন্দ্রনাথ বসু যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এবং তিনিও যুগান্তর পরিচালনা করিতেন। হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল যুগান্তর পড়িয়া এই বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকতা করিতেন—ভদ্রেশ্বর ইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই মোকর্দমায় আসামিগণের মধ্যে নরেন্দ্র গোস্বামী গবর্নমেণ্ট পক্ষের সাক্ষী (approver) হন। বিচারে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের সেশন আদালত হইতে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল—হাইকোর্ট আপিলে তাঁহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, অবিনাশ, হৃষিকেশ প্রভৃতি মোট পনের জনের নির্বাসন-দণ্ড হয়। এই ষড়যন্ত্রের মোকর্দমায় অভিযুক্ত চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর জেলের মধ্যে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে গিয়া সেখানে এপ্রুভার নরেন্দ্র গোস্বামীকে তাড়া করিয়া গুলির উপর গুলি ছুড়িয়া তাহাকে হত্যা করেন। এইজন্য তাঁহাদের উভয়েরই পৃথক বিচার হইয়া ফাঁসী হয়। ফাঁসীর হুকুম হইবার পর কানাইলাল ওজনে ষোল পাউণ্ড বাড়িয়াছিলেন, দু'জনে প্রফুল্লমুখে ফাঁসীকাঠে গিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ভীক নির্বিকার আনন্দময় মূর্তি দেখিয়া জেলের সাহেব ও বাঙালী কর্মচারিগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন—' কবির এই বাণী কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রের জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। কানাই ও সত্যেন্দ্রের

মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহাদিগকে অতুল সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল। তাঁহারা অমর হইয়াছেন। জেল-হাজতে থাকিবার সময়ই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ঈপ্সিত ভগবৎ-সাধনা ও যোগ-অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। আলিপুর বোমার মোকদ্দমার পর তিনি রাজনৈতিক কর্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। মোকদ্দমার সময় হইতেই তাঁহার অন্তরের সত্যবস্তু—যাহার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছিলেন। এই নির্জন কারাবাস যেন তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক পথে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া এখন পণ্ডিচারিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আছেন। বারীন্দ্র প্রভৃতি আর আর যাঁহারা মুখ-পাত্র হইয়া বিপ্লবের কর্ম করিতেছিলেন তাঁহারাও ঘটনাক্রমে কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া গেলেন। এই সঙ্কট-সময়ে বিপ্লবী-দিগের অবশিষ্ট প্রধান কর্মীদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই পশ্চিম বঙ্গে বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফাঁসী দ্বীপান্তর কারাগার কিছুতেই তরুণ বিপ্লবীগণের মনে ভয় আসিল না; বরং তাহাদের মধ্যে বিপ্লবের অগ্নি আরো ভয়ানকভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালেই ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে নদীয়া জেলার রায়টাতে এবং ১৯০৯ সালের নবেম্বর মাসে হলুদবাড়ীতে দুইটী ডাকাতি হইয়াছিল। আলিপুরের সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়—যিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন—১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুর ফৌজদারি আদালতে প্রকাশ্য স্থানে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। এই সময় হইতেই সি-আই-ডি পুলীশ যতীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ নজর রাখিতে

আরম্ভ করে। মুরারিপুকুরের সংস্রবে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় পুলীশ অন্যান্য যে সকল বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই এক বেড়াজালে ছাঁকিয়া তুলিবার মতলবে সকলের বিরুদ্ধে একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা করিবার পরিকল্পনা করিল। বিপ্লবীদলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট এইরূপে প্রস্তুত হইতেছিল। ইহার ফলে ১৯০৯ সালে বাঙ্গলার মফস্বল সহরে অবধি খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়া গেল। মৌলবী সামস্থল আলম নামক কলিকাতা পুলীশের একজন বড় সি-আই-ডি অফিসার—যিনি আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির ও সাক্ষী-সংগ্রহ ইত্যাদি করিয়াছিলেন, তিনিই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ভার লইয়া তাহার আয়োজন ও আবশ্যকীয় তদ্বির করিতেছিলেন। বিপ্লবীগণ সেইজন্য ১৯১০ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের সিঁড়ির উপর রিভলভারের গুলিতে হত্যা করে। তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন, অন্য কেহ তখন ঐ সিঁড়িতে ছিল না—বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত নামক একটী আঠারো বৎসরের বালক সেই সময় তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে গুলি করিয়া মারে। মারিবার পর সে অনায়াসেই পলাইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াও সে রিভলভার ছুড়িতে থাকিল। রাস্তার পুলীশ-সার্জেণ্ট তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর পুলীশের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথই সামস্থল আলমকে হত্যা করিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে যতীন্দ্রনাথের মামার কলিকাতার বাসায় তাঁহার অপর এক মামা খুব অসুস্থ হইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ কয়েকটী যুবককে লইয়া কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রি-দিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন। হত্যাকারী বীরেন্দ্রও ঐ শুশ্রূষাকারীদিগের মধ্যে একজন। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে জানুয়ারী মাসেই পুলীশ যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ন-মামা ও কৃষ্ণনগর হইতে ছোট মামা ও তাঁহার ক্লার্ক নিবারণ মজুমদার গ্রেপ্তার হন। পুলীশ যতীন্দ্রনাথের ন-মামাকে লালবাজার লক-আপ হইতেই ছাড়িয়া দিয়াছিল কিন্তু তাঁহার ছোট মামাকে (বর্তমান লেখক) ছয়মাস কাল প্রেসিডেন্সি জেলের নির্জন সেলের ক্ষুদ্র কক্ষে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল। Howrah Gang Caseযখন নিম্ন আদালতে চলিতেছিল, সেই সময়ে প্রমাণাভাবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। বর্তমানে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদারও তাঁহাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথকে ও অন্য কয়েকজনকে চারিদিন না খাইতে দিয়া লালবাজার পুলীশ লক-আপে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ চারিদিনে পুলীশ—বিশেষ করিয়া কুমুদ সেন নামক এক সি-আই-ডি দারোগা যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে অজ্ঞাতস্থানে চির-নির্বাসিত করিবার ও শারীরিক যন্ত্রণা দিবার ভয় ও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ পুলীশের ঐসকল হুমকীতে ও প্রলোভনে ভুলিবার পাত্র নহেন, তাহা ঐ দারোগা বুঝিয়াও বুঝে নাই। ঐ কুমুদ সেন ও আরো দু-চারিজন বাঙ্গালী দারোগা লালবাজার লক-আপে আসিয়া রীতিমত অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিত। যতীন্দ্রনাথকে শুনাইয়া প্রথমে একজন বলিত, 'এই সকল পাকা অপরাধীর পেটের কথা আদায় করিতে আজ জাপানী যন্ত্রণা-দান প্রণালী কাজে লাগাইতে

হইবে।' দ্বিতীয় জন যেন কিছু জানে না, এমনিভাবে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'সে কি রকম?' প্রথম জন বলিতে লাগিল, 'ভিতরের কথা ইনি প্রকাশ করিয়া না বলিলে আজ সারারাত্রি এঁকে ঠাণ্ডা বরফ-জলের টবে বসাইয়া রাখা হইবে, আর উঁচুতে-রাখা একটা পাত্র হইতে বরফ-গলা জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এঁর মাথার উপর পড়িতে থাকিবে। অপরাধীর নিকট হইতে কথা বাহির করিবার জন্য এই জাপানী উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা যাক ইনি সত্য কথা বলেন কিনা। নেহাৎ কিছু না বলিলে একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ির জানালা-দুয়ার বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে পুরিয়া হুইশিল দিবা মাত্র কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে তাহা ইনি জানিতেও পারিবেন না।...... তার চাইতে সব বলিয়া ফেলুন না?' যতীন্দ্রনাথ এই সকল ভদ্রবেশধারী পুলীশের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া চুপ করিয়া থাকায় তাহাদের সকল অভিনয় ব্যর্থ হইয়া যাইত।

একদিন এক ফিরিঙ্গি পুলীশ আসিয়া যতীন্দ্রনাথকে বড় জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। "You will get fine girls and best wines" (সুন্দরী তরুণী ও উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে পাইবেন)।

"Shut up you fool. I never touched wine in my life," (মুর্খ, থামো, আমি জীবনে কখনও মদ ছুঁই নি)—বলিয়া যতীন্দ্রনাথ রাগিয়া সামনের টেবিলের উপর জোরে কিল মারিয়া তাহাকে তাড়া করিতেই ফিরিঙ্গিটি দূরে সরিয়া সরিয়া গেল। "I don't believe it" (আমি ইহা বিশ্বাস করি না) বলিয়া সে চলিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে অগ্নি-দীপ্তি ছিল, তাহার প্রভাব সহ্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইত না।

যতীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহার ছোট মামাকেও পুলীশ ঐরূপ ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়াছিল। লালবাজার লক-আপে তাঁহাকেও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনিই এই বিপ্লবীদলের বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা এবং অর্থ-সাহায্যকারী—পুলীশ এইরূপ অনুমান করিয়াছিল। আলিপুর বোমার মামলার সময়েই পুলীশ তাঁহাকে জড়াইবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। এবারে আপন কোঠায় পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছামতো স্বীকারোক্তি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং টেগার্ট সাহেব লালবাজার লক-আপে প্রতিদিন একবার-দুবার করিয়া আসিয়া তাঁহাকে কেবলই বলিতেন,—"Can't you help the Government? Can't you help yourself?" (আপনি কি গভর্নমেণ্টের ও নিজের উপকারে আসিতে পারেন না?") টেগার্টের কথার উত্তর না করিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। টেগার্ট অনেক রকম বক্তৃতা দিয়া মন্দ পরিণামের ভয় দেখাইয়া শেষে চলিয়া যাইতেন। টেগার্ট যাইবার পর সি-আই-ডির দল আসিয়া নানারূপ অভিনয় করিত। পুলীশের সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়া ভাল হইবে না বিবেচনায় যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুধু চুপ করিয়া থাকিতেন। সি-আই-ডির দল তাঁহাকে অবশেষে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। মুহুরি নিবারণ মজুমদারকে লালবাজার লক-আপে একদিন সারারাত্রি অন্য একটি লোকের সঙ্গে হাতে হ্যাণ্ডকাফ ও পায়ে বেড়ী লাগাইয়া খালি মেজেয় ফেলিয়া রাখিয়াছিল। সঙ্গের সেই লোকটি পুলীশেরই লোক, সে আসামী সাজিয়া নিবারণকে কেবলই ফুঁসলাইতেছিল,—"মহাশয়, আমাকেও ধরিয়া আনিয়াছে, আর পারা যায় না। আসুন, যাহা জানি—বলিয়া

ফেলি। আপনি কি জানেন বলুন ত?" ইহা যে পুলীশেরই ষড়যন্ত্র নিবারণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—"যা জানেন, আপনি বলুন গে। আমি কিছু জানি না, মিথ্যা বানাইয়া কিছু বলিতে পারিব না।" পুলিশ নিবারণকে প্রহার করিতেও ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তাহাদের কৌশল সফল হয় নাই। তৎকালীন পুলিশের রীতি-নীতি দেখাইবার জন্যই লালবাজার লক-আপের এই অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

কিন্তু অন্য একটী দিক না দেখাইলে অন্যায় হইবে। একজন খাঁটি বিলাতি পুলিশ-সার্জেণ্ট যতীন্দ্রনাথের ছোট মামার লক-আপের পাহারায় থাকিত। সে প্রতিদিন সকালবেলা একখানি করিয়া স্টেটসম্যান সংবাদপত্র কিনিয়া তাঁহাকে পড়িতে দিত। তাঁহার জন্য জামিনের দরখাস্ত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে বলিত ও এই বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিত যে টেগার্ট আসিবামাত্র অথবা কাহারও আসিবার পায়ের শব্দ শুনিলেই তিনি যেন দোতলার উপর ঐ ঘরের খোলা জানালার গরাদের মধ্য দিয়া স্টেটসম্যান সংবাদপত্রখানি বাহিরে ফেলিয়া দেন। লক-আপে থাকিবার সময় ঐ পুলিশ সার্জেণ্টটি সুযোগ বুঝিয়া প্রতিদিনই তাঁহাকে বলিত—"Perhaps you require a bath—" (আপনার হয়তো স্নান করিবার দরকার)। এই বলিয়া তাঁহারে ঘরের চাবি খুলিয়া পাশে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিত ও তাড়াতাড়ি পুনরায় লক-আপে ঢুকাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিত। দুঃখের বিষয়, জেল হইতে মুক্ত হইবার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ সার্জেণ্টটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব হয় নাই।

চারি দিন লালবাজার লক-আপে রাখিবার পর যতীন্দ্রনাথ, তাঁহার ছোট মামা ও ছোট মামার ক্লার্ককে পুলীশের ভ্যানে করিয়া সশস্ত্র সিপাহী সঙ্গে দিয়া হাওড়া জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। জেলে ঢুকিবার পূর্বে কাহারও সঙ্গে কিছু আছে কিনা হাওড়ার জেলার তাহা পরীক্ষা করিয়া লইলেন। যতীন্দ্রনাথ হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় তাঁহার ভগিনীকে লইয়া গিয়া স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরু ভোলানন্দ তাঁহাকে একটি মন্ত্রঃপূত রুদ্রাক্ষ দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রনাথ তাহা গলায় পরিয়া থাকিতেন। হাওড়ার জেলার অকারণ জিদ ধরিলেন, গলার ঐ রুদ্রাক্ষটি খুলিয়া রাখিয়া জেলে ঢুকিতে হইবে। যতীন্দ্রনাথ কিছুতেই তাহা খুলিতে সম্মত না হওয়ায় জেলারের সহিত তাঁহার বাদ-প্রতিবাদ হইতে থাকিল। সেখানে উপস্থিত সিপাহী-সান্ত্রী জোর করিয়া ঐ রুদ্রাক্ষ খুলিয়া লইতে উদ্যত হইলে যতীন্দ্রনাথ অবিচলিতভাবে বলিলেন—"যদি ভাল চাও, তবে আমাকে কেহ স্পর্শ করিও না—জোর করিয়া আমার সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমার প্রাণ থাকিতে আমি গলার রুদ্রাক্ষ খুলিতে দিব না।" বেগতিক বুঝিয়া জেলার শেষে যতীন্দ্রনাথকে ঐ রুদ্রাক্ষ সহ জেলে লইতে বাধ্য হইলেন।

হাওড়ার জেলে থাকিবার সময়ে গভর্নমেণ্টের তখনকার চীফ-সেক্রেটারি ডিউক সাহেব এবং টেগার্ট প্রভৃতি পুলীশ জেলে আসিয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ছোট মামাকে নানা প্রশ্ন করেন। যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা একজন সম্ভ্রান্ত উকিল, তিনি ইনকামট্যাক্স দিয়া থাকেন, আবশ্যক হইলে তাঁহাকে পুনরায় সহজেই ধরিয়া আনা যাইতে পারিবে—ডিউক সাহেব সঙ্গের পুলীশদের একথা বলা

সত্ত্বেও পুলিশ তাঁহাকে ছাড়িয়া না দিয়া বিচারাধীন অবস্থায় অকারণ ছ'মাস জেলে রাখিয়া দিয়াছিল। সেখানে সকলে একসঙ্গে আছেন দেখিয়া ও ঐদিন যতীন্দ্রনাথের মেজমামা বাড়ি হইতে রান্না-করা খাবার লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন—তাহা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথকে আলিপুর সেণ্টাল জেলে এবং তাঁহার ছোটমামা ও নিবারণকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সামসুল আলমের হত্যার পর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া যতীন্দ্রনাথ সহ একসঙ্গে পঞ্চাশ জনের বিরুদ্ধে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা নামে ১৯১০ সালের মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট খুব বড় রকমের একটী ষড়যন্ত্রের মোকর্দমা আরম্ভ করেন। তাহাতে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, হত্যার সহযোগিতা, ডাকাতি করা ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করা হয়। হাইকোর্টের সেসনে ঐ মোকর্দমা বিচার না হওয়া অবধি যতীন্দ্রনাথ ও আর সকলকে এক বৎসরের অধিক কাল জেল-হাজতে Solitary Cellএ কাটাইতে হইয়াছিল। আলিপুর বোমার মোকর্দমার এপ্রুভার নরেন্দ্র গোস্বামী জেলে খুন হইবার পর যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহ-অভিযুক্ত সকলকে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল—ও নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকালে বিকালে সকলকেই উলঙ্গ করিয়া দেহ তল্লাসী করিয়া পুনরায় Cellএ চাবি বন্ধ করিয়া রাখা হইত। Cell বলিতে নয় ফুট দীর্ঘ-প্রশস্ত একটি ক্ষুদ্র কুঠারি; তাহারই একাংশে আলকাতরা-মাখানো দু'টী বাঁশের টুকরিতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত ও তাহা পরিষ্কার না হওয়া অবধি তাহার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। আহারের জন্য একখানি লোহার থালা ও একটী লোহার বাটি থাকিত, তাহা নিজেকেই ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইত। মার্চ-এপ্রিল

মাল অবধি—জেলের ক্ষেতের মূলা না শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহারই তরকারী একটানা চলিয়াছিল। Cellএর সামনে লোহার গরাদের দুয়ার ছিল, কোন জানালা ছিল না। এই ক্ষুদ্র গহ্বরে বাস করিবার সময় রাত্রিতে জল পিপাসা পাইলে জল পাইবার কোন উপায় ছিল না। কোর্ট হইতে গোরাসৈন্য আসিয়া রাত্রিতে পাহারা দিত। কেহ কাহারও সহিত কোন কথা কহিতে পারিত না, কথা কহিবার নিয়ম ছিল না। স্নানের সময় সামান্য ক্ষণের জন্য এক একজন করিয়া আনা হইত। তাহা ছাড়া দিনরাত সকলকে Cell-এর মধ্যে চাবি-বন্ধ হইয়া থাকিতে হইত। সন্ধ্যার পূর্বে পরণের জামা-কাপড় Cell-এর বাহিরে রাখিয়া জেলের জাঙ্গিয়া পরিয়া থাকিতে হইত। ঐ সময়ে এবং পুনরায় সকালবেলা জেলার আসিয়া এক এক করিয়া প্রত্যেকের জাঙ্গিয়া খুলিয়া কাহারও নিকট কোন অস্ত্র লুকানো আছে কিনা তাহা সার্চ করিয়া দেখিয়া যাইত সকলকেই প্রতিদিন সকালে বিকালে Cell বদল করিতে হইত। কাহাকেও কোন নির্দ্দিষ্ট Cellএ থাকিতে না দেওয়া এবং কে কোন Cellএ থাকিতেছে তাহা কাহাকেও জানিতে না দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এ সমস্তই নরেন গোঁসায়ের হত্যার পর; চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে—সেইরূপ ব্যবস্থা।

একদিন Cell বদল হইবার পর দেখা গেল, একটি ছেলে তাহার Cellএর দেয়ালের গায়ে নখ দিয়া আঁচড় কাটিয়া 'সাধনার স্বর্গদ্বার' কথাটি লিখিয়া রাখিয়াছে। হয়তো তাহার মনে ঐরকম কোন ভাব আসিয়াছিল, তাই লিখিয়াছিল। Cell বদল হইবার পর প্রত্যেকটি Cell এত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হইত যে ঐ নখের আঁচড়ে লেখাও পুলীশের চোখে পড়িয়া writings on the wall

(দেয়ালে লেখা) বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জেলের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। জেলার প্রভৃতি আসিয়া তখনই তদন্ত আরম্ভ করিল। ঐ কথাগুলির কি মানে, উহার ইংরাজি করিয়া দিবার জন্য যতীন্দ্রনাথের ছোট মামাকে তাঁহার Cellএর বাহিরে আনিয়া উহা দেখাইল। কি জানি কেন—জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটু সম্মান করিতেন। তিনি উহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। উহা সত্ত্বেও যে উহা লিখিয়াছিল সে অন্যের উদ্দেশ্যে দেয়ালের গায়ে কোন গুরু সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছে, এই সন্দেহে জেলার সাহেব বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। নরেন গোঁসায়ের হত্যার পর জেলকর্তৃপক্ষের মনে খুব ভয় হইয়াছিল। লেখাগুলি দেখিয়া যতীন্দ্রনাথের ছোট মামার মনে হইয়াছিল, জেলখানা সাধনার স্বর্গদ্বার না হইলেও উহাকে সাধনার সূতিকাগার বলা যাইতে পারে। এই স্থানেই অনেকের মনে প্রথম ধর্ম ভাব প্রসূত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনার আলোক কারাকক্ষে বসিয়াই লাভ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র সকলকে ছাড়িয়া জেলের এই কঠোরতার মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করিতে পারিতেন ও তাহাই করিয়াছিলেন—কোনও দিন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ভগবানের উপর তাঁহার অসীম নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি তাহা পারিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট মামার মনে তেমন বল ও নির্ভরতা ছিল না। একদিন রাত্রে তিনি চিন্তায় ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিরুপায় ভাবে Cellএর মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। জেলের রাজনৈতিক বিচারাধীন বন্দীদিগের খাবার পরিবেশনের জন্য দু'জন কয়েদি ছিল—গয়া জিলায় তাহাদের বাড়ী, দাঙ্গা করার অপরাধে তাহাদিগের জেল হইয়াছিল। রাজনৈতিক

বন্দীদিগের সম্বন্ধে কোনও খবর যাহাতে অন্য কাহাকেও না দিতে পারে, এই জন্য তাহারাও সেইখানে বন্দী থাকিত। রাজনৈতিক বন্দীদিগের সঙ্গে তাহাদের কথা বলা বারণ ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একজন ঐ রাত্রিতে যতীন্দ্রনাথের মামার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গোরা প্রহরী না দেখিতে পায় এমন ভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া Cell-এর গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া খুব তাড়াতাড়ি তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়া চলিয়া গেল,—"এতনা ঘাবড়াতা কাহে? আভি তো দরিয়াকো কিনারা পর আয়া হায়, পানিমে গিরেগা, কি নেহি গিরেগা, উস্‌কো কুচ ঠিকানা নেহি। আউর গিরেগা তো কেতনা পানিমে গিরেগা উসকোতি কুচ মালুম নেহি। ঠিক রহো, মৎ ঘাবড়াও।" ঐ অশিক্ষিত সামান্য কয়েদির মুখে ঐ কথাগুলি সেই মুহূর্তে ভগবানের প্রেরিত বাণী বলিয়াই মনে হইল ও অন্তরে ভগবানে একটা নির্ভর জাগাইয়া তুলিল।

আলিপুর বোমার মামলার সময়ে অরবিন্দ বারীন্দ্র উপেন্দ্র উল্লাসকর প্রভৃতি বিচারাধীন বন্দী ছিলেন—নরেন গোঁসায়ের হত্যার পূর্ব পর্যন্ত জেলে তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। তাঁহাদিগকেও Cell-এ বাস করিতে হইয়াছে, আবার সকলে এক ঘরে একত্রও থাকিয়াছেন। ঐ সময় গীষ্পতি কাব্যতীর্থ রাজনৈতিক অপরাধে ঐ একই জেলে যান। তিনি জেলে আসিতেছেন জানিবামাত্র বারীন্দ্র ও আর সকলে জেলে শুইবার জন্য যে কম্বল পাইয়াছিলেন তাহা চারি ভাঁজ করিয়া একটির পর একটি রাখিয়া "আসুন পণ্ডিত মশায়, বসুন"—বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ছোট মামা যখন বিচারাধীন অবস্থায় জেলে ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের সম্পর্কে

জেল-বাসের কঠোরতার পরিসীমা ছিল না। জেলে থাকিতে যতীন্দ্রনাথের ছোট মামার চৌদ্দ সের ওজন কমিয়া গিয়াছিল। জেল-পরিদর্শক মেটা সাহেব জেল দেখিতে গেলে তিনি তাঁহাকে জেলের জঘন্য খাওয়া সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন। মিঃ মেটা তাহার প্রতিকার না করিয়া বলিয়াছিলেন, "You eat the same food outside." জেলের বাহিরেও তোমরা ঐ ডাল-ভাতই খাইয়া থাক, তাহাতে বলিবার কি আছে—এই ভাবের কথা। জেল হইতে বাহির হইয়া যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা অধুনা পরলোকগত স্যার আশুতোষ চৌধুরিকে মেটা সাহেবের ঐ কথা জানাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের ক্লাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাতে মিঃ মেটাকে খুব শুনাইয়া দিয়াছিলেন। জেলে বিচারাধীন বন্দী-দিগের প্রতি এই কঠোর ব্যবহার সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা স্যার আশুতোষ চৌধুরির দ্বারা প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সকেও সবিশেষ জানাইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স ঐ সময়ে ইংলণ্ডে যান ও তৎকালীন ভারত-সচিব মর্লিকে ঐ সম্বন্ধে বলিবার পর বিচারধীন আসামিদিগের সম্বন্ধে নিয়মের কঠোরতার অনেক হ্রাস হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের ছোট মামার এই চেষ্টার ফলে অতঃপর গরমের সময়ে রাত্রিতে Cell-এর সম্মুখে বন্দীদিগের জন্য কুঁজোয় করিয়া জল রাখিয়া দেওয়া হইত, প্রত্যেক বন্দীকে Cellএ একখানি করিয়া হাত-পাখা দেওয়া হইত, বই পড়িতে দেওয়া হইত, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন একঘণ্টা করিয়া Cell হইতে বাহির করিয়া প্রত্যেক বন্দীকে বেড়াইতে দেওয়া হইত। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদিগের কারাজীবন ইহাতে অনেক পরিমাণে সহনীয় হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ ও আর আর বন্দীগণ খুশি হইয়াছিলেন। ১৯১১

সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। মিষ্টার জে. এন. রায় ব্যারিস্টার ঐ মোকদ্দমায় যতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। ঐ মোকদ্দমায় ললিত চক্রবর্তী বলিয়া একজন এপ্রুভার হইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ নামক বালকটি সামসুল আলমকে হত্যা করিয়াছিল ও যতীন্দ্রনাথই তাহাকে হত্যা করিতে পাঠান বলিয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। ফাঁসী হইবার পূর্বে তাহাকে ঐ স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে জেরা করিবার জন্য পুলীশ জে. এন. রায় ব্যারিস্টারকে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি তাহা করেন নাই। প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সের বিচারে ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত সকলেই মুক্তিলাভ করে।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা চলিত থাকা কালেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। বিখ্যাত পুলিনবিহারী দাস ও আর তেতাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট এই মোকদ্দমা করেন। বঙ্গ-বিভাগের পর দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্যারিস্টার পি. মিত্র ঢাকায় গিয়া দেশমুক্তির জন্য প্রত্যেকেরই জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন বলিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁহাদিগের ঐ আহ্বানের ফলে পুলিনবিহারী দাস কর্তৃক ঢাকায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সারা পূর্ববঙ্গে ঐ সমিতির শাখা ও অনুরূপ অন্যান্য সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পুলিন দাস মহাশয়কে রাজবন্দী রূপে নির্বাসিত করা হয় ও তাহার পরদিন হইতেই ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে আইন-বিরুদ্ধ ও অবৈধ বলিয়া প্রচার করা হয়। পুলিনবিহারী দাস ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাসন-মুক্ত হইয়া আসেন। ঐ সনের জুলাই মাসেই তাঁহার ও অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আরম্ভ হয়। ১৯০৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯১০ সালের

সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ডাকাতি এবং রাজেন্দ্রপুরের মেল-ডাকাতি, হত্যা, বোমা ফেলা প্রভৃতি হইয়াছিল। পুলিশের মতে অনুশীলন সমিতির লোকের দ্বারাই উহা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। এই মোকদ্দমার আসামীদের মধ্যে মাত্র চৌদ্দ জনের দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড হয়। ইহার পর ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা হইয়াছিল, তাহাতে ঢাকা সমিতির ২৬ জন আসামী ছিলেন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া স্ত্রীপুত্রের জীবিকার জন্য যতীন্দ্রনাথ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের জেলাবোর্ডের অধীন কনট্রাকটরি কার্য করিতে আরম্ভ করেন। গভর্নমেণ্টের অপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাকে কনট্রাকটরি কার্য দিতেও কোন কোন বোর্ড ইতস্তত করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ দেশের সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া শেষে জেলাবোর্ডের ঐ কাজ পাইয়াছিলেন। এই কাজ উপলক্ষে উপরোক্ত তিনটী জেলার সকল স্থানে ও কলিকাতায় তাঁহাকে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের পুলীশ-বিভাগ হইতে গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ সাইকেলে করিয়া যশোহর জেলার ঝিনাইদহ হইতে নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে ও তথা হইতে মুর্শিদাবাদে একদিনেই পচাত্তর মাইল পথ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করা গুপ্তচরদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহারা অবশেষে যতীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার জিনিষপত্র বহিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিবার অনুমতির প্রার্থনা করিল। যতীন্দ্রনাথ কখন তাহাদের দ্বারা সত্য সত্যই মোট বহাইয়া লইতেন, আবার কখন তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া এমন অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন যে তাহারা তাঁহার কোন

সন্ধানই পাইত না, তাঁহার গতিবিধিও কিছু জানিতে পারিত না। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেমেয়েদের লইয়া কিছুদিন দেওঘর ও কাশীতে গিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানেও পুলীশ তাঁহাকে অনুসরণ করিত। তাহারা সকল সময়ে সকল স্থানে তাঁহার পিছনে না থাকে এ জন্য কাশীতে এক পুলীশের চরকে তিনি বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ পুলীশ তাঁহার পিছু লইতে ছাড়ে নাই। একদিন রাত্রিতে কাশীর বাঙ্গালী-টোলায় এক গলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিলেন। সে নিকটে আসিবামাত্র তাহার হাত ধরিয়া নিজের রিভলভারটী বাহির করিয়া তাহার মুখের উপর ধরিয়া বলিলেন, "তোমাকে বারণ করা সত্ত্বেও কেন তুমি এই রকম জালাতন করিতেছ? এইবার তোমাকে শেষ করিয়া দিই—।" এই বলিতেই সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; যতীন্দ্রনাথের বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। অবশেষে যতীন্দ্রনাথ তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন, "তোমার মত নিকৃষ্ট জীবকে মারিয়া আমি আমার হাত কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু তুমি সাবধান হইও, আর আমার পিছু লইও না।" সেই হইতে গুপ্তচরটি যতীন্দ্রনাথকে সামনাসামনি আর দেখা দেয় নাই।

ইহার অনেক দিন পরে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিপ্লবী-সঙ্গীরা কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে থাকার সময়ে সেখানেও পুলীশ-গুপ্তচরদিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। সেখানে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী বলিয়া যতীন্দ্রনাথের এক সহকর্মী একদিন এক গুপ্তচরকে গুলি করে। সে আহত হইয়া মেডিকেল কলেজে আনীত হইবার পর যতীন্দ্রনাথই তাহাকে মারিয়াছে বলিয়া উক্তি করে।

১৯১১ সালে শুধু পূর্ববঙ্গেই অনেকগুলি বৈপ্লবিক অত্যাচার-উপদ্রব

হইয়াছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিং রাজকীয় শোভাযাত্রা করিয়া মহাসমারোহে দিল্লীর দরবারে ঐতিহাসিক অভিগমন করিবার সময় তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস। লর্ড হার্ডিং আশ্চর্যরূপে রক্ষা পান। যে হস্তিপৃষ্ঠে তিনি শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন সেই হস্তীটি অল্প পরিমাণে আহত হইয়াছিল মাত্র। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা হইয়া যাইবার পর কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটে কিছু দিন আর কোন বৈপ্লবিক হত্যা বা ডাকাতি হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবীগণের অধিনায়ক হইবার পর ১৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার কলেজ-স্কোয়ারে গোলদীঘির ধারে তিন জন বিপ্লবী হেড-কনস্টেবল হরিপদ দেবকে গুলি করিয়া মারে। ১৯১৪ সালে কলিকাতার নিকটবর্তী বরানগর, আলমবাজার, বৈষ্ণবাটী ও আড়িয়াদহে ডাকাতি হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে রাজাবাজার বোমার মামলা হইয়াছিল। কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডের ২৯৬-১ নম্বর বাড়িতে তল্লাসী করিয়া পুলিশ শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা ও অন্যান্য তিন জনকে গ্রেফ্তার করে। তাঁহারা ঐ স্থানে সিগারেটের টিনে বোমা প্রস্তুত করিতেন। সেই টিন ও বিপ্লবসংক্রান্ত কাগজপত্র ঐ বাড়ি তল্লাসী করিয়া পাওয়া যায়। বোমা প্রস্তুত করিবার অপরাধে শশাঙ্কের পনের বৎসর নির্বাসনদণ্ড হয়। শশাঙ্ক হাজরা যে প্রকারের বোমা প্রস্তুত করিতেন, ঐ একই প্রকার বোমা কলিকাতা, ময়মনসিং, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাতে বুঝা যায়, ঐ সকল বোমা এক জন মাত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত না হইলেও মূলে একটিমাত্র ব্যক্তির নির্দেশক্রমেই সব হইতেছিল।

শশাঙ্কের ঘরে একটি লেখা পাওয়া যায়, তাহাতে রক্তপাত ও হত্যা করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে—এইরূপ নির্দেশ ছিল। ইহা হইতেও বিপ্লব-প্রচেষ্টায় একজন মাত্র নেতার কর্তৃত্ব ও পরিচালনাই সমর্থিত হয়। ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলায় প্রাগপুর ও শিবপুরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'টি ডাকাতি হইয়াছিল। দু'টি ডাকাতি কলিকাতা হইতে পরিচালিত হইয়াছিল। প্রাগপুরের ডাকাতিতে পিস্তল ও লোহার সিন্ধুক ভাঙিবার যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ডাকাতির পর নৌকা করিয়া ডাকাত-দল চলিয়া যাইবার সময় নদীর ধার দিয়া গ্রামের লোক তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। তাহাতে ডাকাতগণ তাহাদিগের দলের একজনকে গুলি করিয়া মারিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। শিবপুরের ডাকাতি আরো ভীষণরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। কুড়ি জনের অধিক ডাকাতের হাতে মশার পিস্তল ছিল। জলাঙ্গী নদীর উভয় তীর হইতে গ্রামবাসিগণ ডাকাতের দলকে অনুসরণ করিয়াছিল। ডাকাতরা একজন পুলিশ-কনস্টবলকে হত্যা করিয়াছিল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে নয় জন ধরা পড়িয়াছিল। কৃষ্ণনগর স্পেশাল বেঞ্চে ঐ নয় জনের বিচার হইয়া তাহাদিগের নির্বাসনদণ্ড হইয়াছিল। স্পেশাল বেঞ্চের বিচার ও রায়ের বিরুদ্ধে আর কোন আপিল চলিত না।

১৯১৪ সালের ১৯শে জানুয়ারী সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষ চিৎপুর ও গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় লোকের ভিড়ের মধ্যে দুইজন বিপ্লবী কর্তৃক রিভলভারের গুলিতে নিহত হন। আক্রমণকারীদিগের একজন পলাইয়া যায়, দ্বিতীয় জন—নির্মলকান্ত রায় পলাইতে গিয়া ধরা পড়িয়া যায়। সে দৌড়াইবার সময় অনন্ত তেলী নামক একটি ছোট ছেলে তাহার চাদর চাপিয়া ধরে। নির্মলকান্ত

তাহাকেও গুলি করিয়া মারে। নির্মলের হাতে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ছিল; তাহার দু'টী কার্ট্রিজ ব্যবহৃত হওয়া দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার হাইকোর্টে তাহার দু'বার বিচার হয়। দু'বারই সে অধিকাংশ জুরির মতে নির্দোষ বলিয়া খালাস পায়। বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব দু'বারই তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পুলীশের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটুয্যেকে মারিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে বোমা ফেলা হয়, তাহাতে একজন হেড-কনস্টবল মারা যায় ও দু'জন কনস্টবল আহত হয়। ১৯১৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ইউনিভারসিটি কনভোকেশনে বড়লাট আসিবেন বলিয়া পুলীশ-ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখুজ্জে সেখানে সতর্কতার বন্দোবস্তাদি করিতেছিলেন। হঠাৎ চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী সেখানে আসিয়া দেখা দেয়। চিত্তপ্রিয় একজন ফেরারী আসামী, তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিবার জন্য সুরেশ মুখুজ্জে অগ্রসর হইতেই চিত্তপ্রিয় ও আরও চারিজন বিপ্লবী তাঁহাকে গুলি করিয়া মারে। এই হত্যার ব্যাপার যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

এই সময়ে বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা নূতন আকারে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজ অস্ত্র বিক্রেতা রডা কোম্পানীর এক কেরানী ১৯১৪ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতার কাস্টম হাউস হইতে ২০২ বাক্স অস্ত্র ও গুলিবারুদ-কার্ট্রিজ ইত্যাদি ছাড় করিয়া লইয়া রডা কোম্পানীর গুদামঘরে তাহার ১৯২ বাক্স আনিয়া দেন ও বাকি দশ বাক্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহা পরে আনিয়া দিতেছি বলিয়া ঐ কেরানী কোম্পানীর দোকানে আর না আসিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন।

রডা কোম্পানীর ঐ দশ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র-গুলিবারুদ আর পাওয়া গেল না। ঐ দশ বাক্সে পঞ্চাশটী বড় আকারের মশার পিস্তল ছিল ও তাহাতে ৪৬০০০ বার গুলি ছুঁড়িবার উপকরণ ছিল। মশার পিস্তলগুলির বিশেষত্ব এই যে, ঐ পিস্তল যে বাক্সে থাকে সেই বাক্স পিস্তলের কুঁদোয় লাগাইয়া লইলে তাহা রাইফেলের ন্যায় কাঁধে রাখিয়া ছোড়া যায়। এই ৫০টী পিস্তল বাংলায় বিপ্লবীদিগের নয়টী বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপ্লবীগণ ভাগ করিয়া লইয়াছিল ও পরে বহু হত্যা ও ডাকাতিতে এই পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় যে সশস্ত্র বিপ্লবানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। উহার আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া সারা বাংলা ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুর হইতে দক্ষিণপূর্ব চাটগাঁ এবং উত্তরপূর্ব কুচবিহার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর এই সমগ্র প্রদেশে ইহার কার্য চলিয়াছিল। বাংলার বাহিরে আসাম, বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং পুনায় বিপ্লবপন্থিগণ নানাবিধ উদ্যোগ করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানগুলি, পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতি এবং উত্তর-বঙ্গের দলগুলি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঢাকার অনুশীলন সমিতিই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন ও শক্তিশালী ছিল। এই সকল সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি এক-লক্ষ্য হইয়া একযোগে কার্য করিতেছিল। ইহাদিগের সহযোগিতা ও উদ্দেশ্যের একতা নানাপ্রকারেই প্রতীয়মান হয়। রডা কোম্পানী হইতে অপহৃত মশার পিস্তলগুলি এই সকল বিভিন্ন সমিতির মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে যতীন্দ্রনাথের নিকট এবং সতীশ চক্রবর্তীর অধীন চন্দননগরের দলের নিকট, বিপিন গাঙ্গুলীর দলের নিকট, মাদারীপুরের দলের নিকট, ময়মনসিং,

ঢাকা ও বরিশালের দলের নিকট এই পিস্তলগুলিকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। নানাস্থানে বাড়ি খানাতল্লাসীতে—বিশেষ করিয়া ৩৯নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বাড়ি খানাতল্লাস করিয়া যে Cypher list (সাঙ্কেতিক ফর্দ) পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠানের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কোথায় কোথায় রক্ষিত ছিল, তাহা জানা গিয়াছিল। তামা পিতল প্রভৃতি ধাতুর গোলাকার পাত্রে, চোঙের আকারে ও নারিকেলের খোলে তিনপ্রকার বোমা ও বিস্ফোরক প্রস্তুত হইত।

শেষের দিকে দেখা যায়, বিপ্লবীদিগের একটী শিলমোহর ছিল। তাহাতে ভারতবর্ষে বাংলার উপর সূর্যোদয় হইতেছে—এই চিত্রটীকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং তাহার নিম্নে 'United India' কথাগুলি লিখিত ছিল। গোপীমোহন রায়ের গলিতে ডাকাতি হইয়া ১১৫০০৲ টাকা লইয়া যাইবার পর যাঁহার বাটিতে ডাকাতি হইয়াছিল তিনি বিপ্লবী-দিগের ঐ সিলমোহর-দেওয়া একখানি চিঠি পাইয়াছিলেন। চিঠিখানিতে বন্দেমাতরম্ ও সম্মিলিত-ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্যের বঙ্গশাখা বলিয়া উল্লেখ ছিল। ঐ চিঠি নিম্নোক্তমর্মে লিখিত হইয়াছিল—

"আমাদিগের কলিকাতার রাজস্ব-বিভাগের দু'জন অবৈতনিক কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত টাকার মধ্যে ৯৮৯১৲ টাকা আপনার নিকট ধার স্বরূপ লওয়া হইয়াছিল; উহা পরে সুদ সহ ফেরত দেওয়া যাইবে। আমাদিগের মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্য উপস্থিত উহা আপনার নামে

জমা করিয়া রাখা হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কৃতকার্য হইলে ঐ সমুদয় টাকা একযোগে সুদ সহ আপনাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আপনি আমাদিগের কর্মচারিগণের প্রতি যে সদ্ব্যবহার দেখাইয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির নিকটেই আশা করা যায়। আমাদিগের কর্মচারিগণও নিশ্চয় আপনার সহিত সমান সদ্ব্যবহার করিয়াছে। আপনি কথায়, কার্যে বা অন্য কোনও প্রকারে আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে বা আমাদিগকে পুলীশের হাতে দিলে আমরা আমাদিগের কথা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিব না। পুলীশের কর্মচারিগণ আমাদিগের কর্মপথের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে; সেই জন্য সম্মিলিত-ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র ঐ পুলীশ কর্মচারিগণকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদানে কখনও ত্রুটি করে নাই এবং ইংরাজ গভর্নমেণ্ট শত চেষ্টা করিয়াও ঐ পুলীশ কর্মচারিগণকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আপনাকে তাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি যেন এমন কিছু না করেন—যাহাতে আবার ঐ পুলীশ কর্মচারিগণের রক্তে মাতৃভূমিকে কলুষিত করিতে বাধ্য হই। আপনার ন্যায় বিজ্ঞজনের বুঝা উচিত যে দেশের বৈদেশিক শাসন হইতে দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে দেশ-বাসিগণের স্বার্থত্যাগ, অর্থদান ও সহানুভূতির আবশ্যক। আমাদিগের কর্মের গুরুত্ব বুঝিয়া দেশের ধনিগণ মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক অর্থদানে দেশের সনাতন ধর্মস্থাপনে সাহায্য করিলে আমাদিগকে আর দেশবাসীকে এইরূপে কষ্ট দিতে হইত না। আমাদিগের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে এই ভাবেই আমাদিগকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ও নূতন ক্ষত্রিয়-ধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে দেশকে উদ্ধার করা রূপ মহাযজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি কি আমাদিগের জন্য কিছু ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

জাপানের উন্নতি ও ক্ষমতা তাহাঁর ধনীদিগের দ্বারাই হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য দেশবাসীদিগকে উপযুক্ত মন ও অন্তরে শক্তি দান করুন।"

(স্বাক্ষর) জে. বলমন্ত

মিলিত স্বাধীন-ভারতরাজ্যের বঙ্গশাখার রাজস্ব সম্পাদক

এই সময়ে বিদেশ হইতেও অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। ১৯১২ সালের পূর্ব হইতেই জার্মান এজেণ্ট ও ইয়োরোপের ভারতীয় বিপ্লবীগণকে লইয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভূতপূর্ব ছাত্র হরদয়াল আমেরিকার কালিফর্নিয়ায় গধর বিপ্লবী-দল গঠন করেন, এবং কালিফর্নিয়া হইতে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯১৪ সালে চম্পকরমণ পিলে নামক একজন তামিল যুবক বার্লিনে গিয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে গধর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালকে এবং তারকনাথ দাস, চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত পরে সানফ্রানসিসকো ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের মোকর্দমার আসামী হইয়াছিলেন। ইঁহারা দু'জনেই আমেরিকায় জার্মানীর ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে কার্য করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিতে ইঁহারা সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর পিংলে বলিয়া একজন মারাঠী ও সত্যেন্দ্র সেন বলিয়া একজন বাঙ্গালী যুবক আমেরিকা হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। পিংলে কাশী চলিয়া যান, সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতাতেই থাকেন। যতীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জার্মানরা ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কতদূর সাহায্য করিতে পারিবে,

তাঁহার সম্বন্ধে অবগত হন। ঐ সময়ে আমেরিকা হইতে গধর-দলের পাঞ্জাবি ও শিখগণ ভারতকে স্বাধীন করিবার কল্পনা লইয়া এদেশে ফিরিতেছিলেন। 'কোমাগাটা মারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজে ঐ সকল শিখ ও পাঞ্জাবীগণের অনেকে কলিকাতা আসিতেছিলেন। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোমাগাটা মারু কলিকাতার নিকট বজবজে আসিলে কলিকাতার পুলীশ তাহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে না দিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে ও অনেককে গুলি করিয়া মারে। এই ঘটনায় যতীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে; এবং বাংলার বিপ্লবীদলকে আরো চঞ্চল করিয়া তুলে।

১৯১৪ সালে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ড প্রভৃতির প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মানীতে যে সকল ভারতীয় ও বাঙালী বিপ্লবী ছিলেন তাঁহারা ভারতে বিদ্রোহ করিবার জন্য জার্মানীর সাহায্যে এখানে অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীগণ শ্যাম, ব্যাংকক, ব্যাটাভিয়া প্রভৃতি স্থানের বিপ্লবীগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া জার্মানীর সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্রাদি আনাইবার ও ১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারতব্যাপী একটি বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিবার পরিকল্পনা স্থির করিলেন। যতীন্দ্রনাথ পূর্ব হইতেই পশ্চিম-বাঙ্গলার বিপ্লবীনেতা স্বরূপে কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে বাংলার বিপ্লবীদের যে সকল বিভিন্ন দল ছিল, তাহারা সকলেই একত্র ও একমত হইয়া যতীন্দ্রনাথকেই এই বিরাট বিপ্লবানুষ্ঠানের নেতৃত্বে বরণ করে এবং বেনারসের শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি বিপ্লবীগণ যতীন্দ্রনাথকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লন। এখন হইতে সমগ্র বাংলার বিপ্লব-নেতা স্বরূপে যতীন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিদেশ হইতে

অস্ত্রশস্ত্র আনাইতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাহা অন্য প্রকারে সংগ্রহ করিবার উপায় না থাকায় ডাকাতি করিয়া তাহা সংগ্রহ করাই বিপ্লবীগণ স্থির করিলেন। এই জন্যই যতীন্দ্রনাথকে স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত হইতে হয়। বিপ্লব-আন্দোলনের প্রথমেই 'ভবানী-মন্দির' যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ব্যতীত 'যুগান্তর' কাগজের বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ একত্রে সঙ্কলন করিয়া "মুক্তি কোন্ পথে" এবং 'বর্তমান রণনীতি' নামে দুইখানি বৈপ্লবিক পুস্তক বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায়, বিপ্লবীগণ ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা পূর্ব হইতেই সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ-আধিপত্যের অবসান করাই 'যুগান্তর' কাগজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। ঐ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়াই উহা পরিচালিত হইয়াছিল। উহার নানা প্রবন্ধে তরুণ যুবকগণের দল-গঠন করিবার ও স্বাধীনতার জন্য তাহাদিগের সকল চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত করিবার এবং যুদ্ধ, রক্তপাত ও মৃত্যু এই সকলের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখান হয়। ডাকাতি ও বলপ্রয়োগ দ্বারা দেশমুক্তির উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করা যে অপরাধের কর্ম নয়, তাহা যুগান্তরের ১৯০৭ সনের ৩রা মার্চ তারিখের সংখ্যায় বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছিল। তাহাতে আরো বলা হইয়াছিল, দেশের বর্তমান অবস্থায় সর্বত্র অশান্তি সৃষ্টি করাই বিশেষভাবে আবশ্যক। এই অশান্তিরই অপর নাম বিপ্লব। 'ভবানী-মন্দির', 'যুগান্তর' 'মুক্তি কোন্ পথে' ও 'বর্তমান রণনীতি' এইগুলিই বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক সাহিত্য। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে 'বর্তমান রণনীতি' লিখিত হইয়াছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য গঠন, যুদ্ধ-কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে ও সমর-শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকে অনেক

কথা বলা হইয়াছিল। ইহাতে বোমা প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী দেখান হইয়াছিল, ঐ একই প্রণালীর অনুরূপ লিপি মানিকতলার বাগানবাড়িতে, বম্বে প্রদেশের নাসিকে সাভারকরের বাড়িতে ও লাহোরে ভাই পরমানন্দের বাড়িতে পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল বিষয় ব্যতীত 'বর্তমান রণনীতি' পুস্তকে প্রচার করা হইয়াছিল, যে কর্ম হইতেই অর্থ ও মুক্তি লাভ করা যায়। এই কর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই হিন্দুগণ শক্তির উপাসনার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তরুণদিগের বল ও শক্তি যুদ্ধ করিবার কার্যে নিয়োগ করা এবং বিপদের সম্মুখীন হইয়া বীরের গুণ ও সাহস অর্জন করা তাহাদিগের কর্তব্য। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার জন্য কলিকাতার গার্ডেনরিচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতির দ্বারা ৪০০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। নেতা যতীন্দ্রনাথ এবং বিপিন গাঙ্গুলীর নির্দেশমত ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গার্ডেনরিচে ডাকাতি হয়। বার্ড কোম্পানীর এক দারোয়ান ব্যাঙ্ক হইতে ২০০০০ টাকা লইয়া গার্ডেনরিচে এই কোম্পানীর মিলে যাইতেছিল; তাহার নিকট হইতে ১৮০০০৲ টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। ১৯১৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলিয়াঘাটায় যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক চাউল-ব্যবসায়ীর ক্যাসিয়ারের নিকট হইতে ২২০০০৲ টাকা জোর করিয়া লইয়া আসা হয়। বেলিয়াঘাটায় বিপ্লবীগণ ট্যাক্সি করিয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ডাকাতির পর ঐ ট্যাক্সি-ড্রাইভার কথানুসারে না চলায় তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ট্যাক্সি হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের প্রথমেই জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ইয়োরোপ হইতে বম্বে আসিয়া পৌঁছান ও জার্মানী, যে বিপ্লবে

সাহায্য করিবে তাহা বাংলার বিপ্লবীগণকে • জানান। তিনি ব্যাটাভিয়ায় কার্য করিবার জন্য একজন এজেণ্ট সেখানে পাঠাইতে বলেন। যতীন্দ্রনাথ পূর্বেই বিপ্লবী ভোলানাথ চাটুয্যেকে ব্যাংককে পাঠাইয়াছিলেন ; এক্ষণে ব্যাটাভিয়ায় যে সকল জার্মান ছিল তাহাদের সহিত কার্য-প্রণালী স্থির করিবার জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে এপ্রিল মাসে ব্যাটাভিয়ায় পাঠান হইল। নরেন্দ্র সেখানে গিয়া সি. মার্টিন— এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন। এই এপ্রিল মাসেই বিপ্লবীগণ অবনী মুখুয্যে নামক আর একজনকে জাপানে পাঠাইয়াছিলেন।

মার্টিন 'নরেন্দ্র ভট্টাচার্য' ব্যাটাভিয়ায় Theodor Helffarich নামক এক জার্মানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'মেভারিক' নামক জাহাজে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি করাচীতে আসিতেছে—হেলফারিক ইহা মার্টিনকে জানাইলেন। মার্টিন ঐ জাহাজ বাংলায় আনাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। সাংহাই-এর জার্মান-কনস্থলারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাই স্থির হইল। তদনুসারে 'মেভারিক' জাহাজ হুনলুলু হইয়া জাভা অভিমুখে যাত্রা করিল। মার্টিন 'মেভারিক' জাহাজের মাল সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নামক স্থানে নামাইবার ব্যবস্থা করিতে জুন মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই 'মেভারিক' জাহাজযোগে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেল চারি শত বার ছুঁড়িবার উপকরণ এবং দুই লক্ষ টাকা এখানে আসিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল মুখুয্যে, ভোলানাথ চাটুজ্জে, অতুল ঘোষ ও মার্টিন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য 'মেভারিক' জাহাজের ঐ মাল কি করিয়া কোথায় নামাইয়া লওয়া যায় তাহা ঠিক করিতে ও উহা সুবিধামতো কাজে লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'মেভারিকের'

অস্ত্রশস্ত্রাদি তিন ভাগ করিয়া (১) হাতিয়ায় (সেখানে বরিশালের পার্টি কার্য করিবেন), (২) কলিকাতায়, এবং (৩) বালেশ্বরে—এই তিন স্থানে পাঠান হইবে তাঁহারা স্থির করিলেন।

বাংলায় যে ইংরাজ-সৈন্য ছিল, তাহাদিগের সহিত লড়িতে বিপ্লবীদিগের সংখ্যাই যথেষ্ট। কিন্তু অন্য স্থান হইতে বাংলায় সৈন্য প্রেরিত হইলে তাহা ভয়ের কারণ হইবে। এইজন্য যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা বাংলায় আসিবার রেল-লাইনের প্রধান প্রধান পুলগুলি উড়াইয়া দিয়া বাংলায় আসিবার তিনটি রেলওয়ে-লাইন আটক রাখা স্থির করিলেন। স্থির হইল, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে থাকিয়া মান্দ্রাজ রেল-লাইনের ভার লইবেন। বি. এন. রেলওয়ে লাইনের ভার লইবার জন্য ভোলানাথকে চক্রধরপুর পাঠান হইল। সতীশ চক্রবর্তী অজয় নদের উপর ই. আই. রেলওয়ে লাইনের পুল উড়াইয়া দিবেন স্থির হইয়াছিল। নরেন চৌধুরী ও ফণি চক্রবর্তীকে হাতিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সেখানে তাঁহারা বিপ্লবীগণকে একত্রিত করিয়া প্রথমে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিকে অধিকারে আনিয়া সেখান হইতে কলিকাতা অভিমুখে আসিবেন। কলিকাতার বিপ্লবীদল নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলীর অধীনে কলিকাতা-অঞ্চলে যে-সকল বন্দুক আছে প্রথমে তাহা দখল করিয়া পরে ফোর্ট উইলিয়ম অধিকার করিবেন। 'মেভারিক' জাহাজে যে সকল জার্মান-অফিসার আসিতেছিল, তাহারা পূর্ববঙ্গে থাকিয়া সামরিক শিক্ষা দিবে এইরূপ স্থির হইল।

যাদুগোপাল মুখুয্যে রায়মঙ্গলের নিকটবর্তী এক জমিদারের সহিত স্থির করিয়াছিলেন—তিনি 'মেভারিক' জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র নামাইবার জন্য লোক ও যানবাহন যাহা লাগিবে তাহা দিয়া সাহায্য

করিবেন। 'মেভারিক' রাত্রিতে আসিয়া পৌঁছিবে, এই কথা ছিল। 'মেভারিক' জাহাজে খাড়া ভাবে সারি সারি আলো ঝুলিবে—ইহা দেখিয়া চেনা যাইবে। অতুল ঘোষের নির্দেশানুসারে 'মেভারিক' হইতে মাল নামাইবার জন্য কতকগুলি লোককে নৌকা করিয়া রায়মঙ্গলের সন্নিকটে পাঠান হইল। তাহারা সেখানে দশ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ১লা জুলায়ের মধ্যেই 'মেভারিক' জাহাজে আনীত অস্ত্রশস্ত্র বিতরিত হইয়া যাইবে বলিয়া বিপ্লবীগণ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইয়া গেল, তবুও 'মেভারিক' জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল না। এত বিলম্ব হইতেছে কেন, ব্যাটাভিয়া হইতে তাহার কোনই সংবাদ আসিল না। ব্যাঙ্কক হইতে আত্মারাম নামক একজন শিখ বিপ্লবীর নিকট হইতে একজন বাঙালী সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, শ্যামের জার্মান-কনসাল নৌকা করিয়া পাঁচ হাজার রাইফেল ও গুলিবারুদ এবং একলাখ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাইয়াছেন। 'মেভারিক' জাহাজের মালের পরিবর্তে উহা আসিতেছে—এইরূপ ভাবিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠান সম্বন্ধে গোড়ায় যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার কোনরূপ পরিবর্তন যেন না হয় তাহা হেলফারিককে বলিবার জন্য ব্যাঙ্ককের ঐ বাঙালীটিকে পুনরায় ব্যাটাভিয়া হইয়া ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া যাইতে হইল এবং অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি যাহা পাঠাইবার তাহা সন্দীপে হাতিয়ায় ও বঙ্গোপসাগরের কূলে বালেশ্বরে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইল। যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে বালেশ্বরে চলিয়া গিয়াছিলেন। পুলীশ ইতিপূর্বে জানিতে পারিয়াছিল, অমরেন্দ্র চাটুজ্যে ও রামচন্দ্র মজুমদার—শ্রমজীবী-সমবায় নামক একটি স্বদেশী বস্ত্রালয়ের অংশীদার এই দু'জন—তাঁহাদের দোকানে অনেক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ, অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের

সহিত পরামর্শ চালাইতেছিলেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে বিপ্লবীগণ অস্ত্রশস্ত্র নামাইবার যে আয়োজন করিতেছিলেন, পুলীশ ও গভর্নমেণ্ট জুলাই মাসেই তাহার খবর জানিতে পারিয়াছিল এবং গভর্নমেণ্ট এই সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সম্ভবত এই কারণে অথবা অন্য যে কারণেই হোক 'মেভারিক' জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র সহ সুন্দরবনে অথবা বালেশ্বরের উপকূলে আসিয়া পৌছিল না। সাংহাই-এর জার্মান কনসাল-জেনারেল আরও দু'খানি জাহাজের একখানি রায়মঙ্গলে ও অপরখানি বালেশ্বরে, পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ জাহাজ দু'খানিতে ত্রিশ হাজার রাইফেল, আট নয় লক্ষ কার্ট্রিজ, দু'হাজার পিস্তল ও হাত-বোমা ইত্যাদি আসিত, কিন্তু তাহাও আর আসিয়া পৌছায় নাই। 'মেভারিক' জাহাজ জাভায় আসিলে ডাচ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক খানাতল্লাস হইয়া উহা ফেরত গিয়াছিল। নীলসেন নামক একজন জার্মানের নির্দেশানুসারে দুইজন চীনাম্যান ১২৯টি অটোমেটিক পিস্তল এবং ২০৮৩০ রাউণ্ড গুলিবারুদ শ্রমজীবী-সমবায়ের অমরেন্দ্র চাটুজ্যের ঠিকানায় কলিকাতায় পৌছিয়া দিবার জন্য কাঠের তক্তার বাণ্ডিলের মধ্যে লুকাইয়া আনিতেছিল। তাহারা সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল-পুলীশের হাতে ধরা পড়িয়া যায় ও তাহাদের বিরুদ্ধে মোকর্দমা হয়। অমরেন্দ্র চন্দননগরে গিয়া আশ্রয় লন। রাসবিহারী বসু তখন নীলসেনের বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে অবিনাশ রায় নামক আর একজন বিপ্লবীও ছিলেন। তিনি এবং রাসবিহারী এখানে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা আর কার্যত ঘটিয়া উঠিল না। অবনী মুখুয্যেকে জাপানে পাঠান হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিবার পথে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে। তাহার নোটবহিতে নীলসেনের ঠিকানা, চন্দননগরের

মতিলাল রায়ের ঠিকানা, কলিকাতা ঢাকা ও কুমিল্লার অন্যান্য বিপ্লবী-দিগের ঠিকানা লেখা ছিল। ভোলানাথ চাটুজ্যে গয়ায় ধরা পড়িবার পর জেলে আত্মহত্যা করেন। নরেন ভট্টাচার্য 'মেভারিক' জাহাজেই আমেরিকা পলাইয়া যান ও সেখানে আমেরিকান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। 'মেভারিক' জাহাজ আসিয়া না পৌছানোয় এবং গভর্নমেণ্ট ও পুলীশ জানিয়া ফেলায় বিপ্লবীদিগের সশস্ত্র-বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল—ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সন্ধানশক্তি ও অপরিসীম ক্ষমতার নিকট বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা আপাতত পরাভূত হইল।

কোপ্তিপোদার যুদ্ধ

বালেশ্বরে যেখানে মহানদী আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে যতীন্দ্রনাথ সেই মোহানার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ও অস্ত্রশস্ত্র সহ জার্মান-জাহাজ আসিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। বেলিয়াঘাটা ডাকাতির দু'দিন পরে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গিগণ সহ কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে ছিলেন। সেখানে তাঁহার সন্ধানে নীরদ হালদার নামক একব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে ও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করে। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ রিভলবারের গুলিতে নিহত হয়। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহার পরেই ছদ্মবেশে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান ও বালেশ্বরে গিয়া পৌঁছান। যে সময়ে তিনি তাঁহার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ও পুলীশ সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ও বিপ্লবীদিগের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছিল। কলিকাতা পুলীশের গতিবিধি তিনি সম্ভবত বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। পুলীশ কিন্তু মার্চ মাসের শেষেই গুপ্ত-সংবাদ পাইয়াছিল যে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের কোন স্থানে গিয়া লুকাইয়া আছেন। জার্মানীর সাহায্যে বিপ্লবীদের সুন্দরবনে অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার চেষ্টা সম্বন্ধে পুলীশ যে সকল সন্ধান পাইয়াছিল তাহারই ফলে ১৯১৫ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে পুলীশ কলিকাতার হ্যারি এণ্ড সন্স নামক একটি দোকান খানাতল্লাসী

করে ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ঐ দোকানটি ছিল বিপ্লবীদের। জার্মানীর সহিত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পুলীশ যে সংবাদ পাইয়াছিল, তদনুসারে কলিকাতার কতকগুলি সি. আই. ডি. পুলীশ-অফিসার বালেশ্বরে চলিয়া যায় ও সেখানে গিয়া হ্যারি এণ্ড সন্সের শাখা ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে খানাতল্লাসী করে ও একজন বাঙালী যুবককে সেখান হইতে গ্রেপ্তার করে। ঐ যুবকটির নিকট হইতে বিশেষ সন্ধান পাইয়া পুলীশ ময়ূরভঞ্জের নিকটবর্তী পর্বতসমূহের মধ্যে ও জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথের সন্ধান করিতে আরম্ভ করে। পাঁচজন বাঙালী কোপতিপোদার জঙ্গলে লুকাইয়া আছে ও তাহারা একজন গ্রামবাসীকে আহত করিয়াছে বলিয়া পুলীশ সন্ধান পাইয়াছিল। কোপতিপোদা বালেশ্বর হইতে কুড়ি মাইল দূরে। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সঙ্গী—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরি, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পালকে লইয়া এইস্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পুলীশ তাঁহাদিগের এই জঙ্গলাকীর্ণ আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া ফেলিল ও সেখানে খানাতল্লাসী করিয়া সুন্দরবনের একখানি ম্যাপ এবং পেনাং-এর একখানি সংবাদপত্র হইতে 'মেভারিক' জাহাজ সম্বন্ধে সংবাদের একটি কাটিং পাইয়াছিল। এই জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার চারিজন সঙ্গী সহ ঘিরিয়া ফেলা হইল। তাঁহার সঙ্গীরা তখন ধরা পড়িবার পূর্বেই ঐ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য যতীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে জ্যোতিষ পাল খুব অসুস্থ থাকায় ও সে চলিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহাকে ছাড়িয়া যতীন্দ্রনাথ ঐ স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। জঙ্গলের মধ্যেই 'চারিদিকে খাদ-কাটা জঙ্গলে-ঢাকা অপর একটি স্থানে গিয়া তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। পুলীশদল

ক্রমশই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে সশস্ত্র পুলীশ ও সৈন্যগণ সহ সেইস্থানে আসিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়স্থান লক্ষ্য করিয়া পুলীশ ও সৈন্যগণ গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ পুলীশ ও সৈন্যগণের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন—যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইয়া না আসিতে পারে। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে ঐরূপ গুলি চালাচালি হইতে থাকিল ও রীতিমত যুদ্ধ হইতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথের গুলি নিঃশেষ হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত আক্রমণকারী ইংরাজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ও সৈন্যগণ যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নিকটে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই।

যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ ট্রেঞ্চের মধ্যে বসিয়া গুলি চালাইতেছিলেন, পুলীশ ও সৈন্যগণের সহিত রীতিমত লড়াই করিতেছিলেন। পুলীশ ও সৈন্যগণের সংখ্যা ও তাহাদের বন্দুকের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ও তাহাদের অনেক প্রকার অধিক সুবিধা থাকায় এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাহারাই জয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? চিত্তপ্রিয় অবশেষে সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া পড়িল। সে আহত হইবা মাত্র যতীন্দ্রনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন। ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথের উরুতে একটি গুলি আসিয়া লাগিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি গুলি চালাইতেছিলেন। যখন চিত্তপ্রিয়কে তুলিয়া লইতে গেলেন সেই সময়ে আর একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের পেটে লাগিল। তিনিও গুরুতররূপে আহত হইলেন।

চিত্তপ্রিয় আহত হইয়া রণক্ষেত্রেই মারা গিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ আহত হইবার পর তাঁহাকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া

হইয়াছিল। নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ সেই স্থানে গ্রেফতার হইল। বিপ্লব-সংঘটন ও সংগ্রাম করিবার জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হইল। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড হইবার পর সে আন্দামানে গিয়াছিল। সেখানে জেলের খাটুনি ও অত্যাচারে সে পাগল হইয়া যায়। তাহাকে পুনরায় এ দেশে পাঠানো হয়। অতঃপর রংপুর জেলে সে মারা গিয়াছিল। চিত্তপ্রিয়, নীরেন ও মনোরঞ্জনের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরে, জ্যোতিষের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার খোকসাতে। কোপতিপোদার এই যুদ্ধ হইবার সময়ে কলিকাতা হইতে টেগার্ট সাহেব কোপতিপোদায় গিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বালেশ্বর হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতে চাহেন। টেগার্ট সাহেব একটি গ্লাসে করিয়া তাঁহাকে জল দিতে গেলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার হাত হইতে জল না লইয়া টেগার্টকে বলিলেন, "আমি যাহার রক্ত দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার দেওয়া জলে আমার তৃষ্ণা মিটাইতে চাহি না।" যতীন্দ্রনাথের এই উক্তির পরেও তাঁহার প্রতি টেগার্ট কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। যতীন্দ্রনাথের প্রতি টেগার্টের মনোভাব যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে জে. এন. রায় ব্যারিস্টারের সহিত টেগার্টের যে কথা হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছিল। জে. এন. রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "অনেকে বলে, যতীন্দ্রনাথ মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন। এ কথা কি সত্য?" উত্তরে টেগার্ট বলিয়াছিলেন, "Unfortunately he is dead"—(দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি মারা গিয়াছেন।) তাহাতে জে. এন. রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতেছেন কেন?" টেগার্ট উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench" (আমাকে আমার কর্তব্য করিতে হইয়াছিল; তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছেন।) যে ইংরাজ পুলীশ-কমিশনার তাঁহাকে ধরিবার ও দণ্ড দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেই টেগার্টও তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে, বীরত্বে ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সেই অধ্যায় এক রকম শেষ হইয়াছিল।

পরিণতি

কোপতিপোদার সংগ্রামে আহত হইয়া বালেশ্বর হাসপাতালে আনীত হইবার কয়েক দিন পরে ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ হয়।

যতীন্দ্রনাথ জীবন উৎসর্গ করিয়াও তাঁহার দেশকে পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কর্মবীর ও চরিত্রবান পুরুষ বিরল। তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব, তিনি ভগবানে নির্ভরশীল ছিলেন, কখনও মনের বল হারান নাই, কখনও কোন দুর্বলতা দেখান নাই, ধীর স্থির অটল ও অবিচলিত ভাবে নিজের লক্ষ্যপথে চলিয়াছিলেন। আজীবন তাঁহাকে কত বিপদের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে! জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার দিনে জেলের গেটে মিলিত হইয়া লোকে তাঁহাকে কখন অভ্যর্থনা করে নাই বা তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া কোনদিন শোভাযাত্রা করে নাই। সাধারণ দেশবাসীর নিকট কোনদিন কোন উৎসাহ, সহানুভূতি বা সম্বর্ধনা না পাইয়াও যতীন্দ্রনাথ একমাত্র নিজ অন্তরের প্রেরণায় ও কর্তব্যজ্ঞানে চিরজীবন সঙ্কটের পথে চলিয়াছিলেন। তিনি যে সমুদ্রে পাড়ি দিতে বসিয়াছিলেন তাহার কূল দিন দিনই সুদূর হইয়া পড়িতেছিল। তাহা দেখিয়াও তিনি নিজ অন্তরে কখন বিশ্বাস ও শান্তির অভাব বোধ করেন নাই।

ইচ্ছা করিলেই তিনি এই অকূল-পাথার ছাড়িয়া নিরাপদ

শান্তির কূলে উঠিতে পারিতেন। কিন্তু যাহারা বাপ-মা ও নিজের গৃহ ছাড়িয়া ভবিষ্যতের আশা ছাড়িয়া প্রাণের মায়া ভুলিয়া তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিল তাহাদের ছাড়িয়া তিনি নিষ্কণ্টক পথে ফিরিয়া যাইবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। প্রবল বৈদেশিক রাজশক্তির নিকট কত দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের অসাধারণ বল ও অদম্য সাহস দমিত হয় নাই। মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকার না পাইলে মানুষের মতো মরাই শ্রেয়—এই বিশ্বাসেই তিনি জীবনে সকল ভয় তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন। বৈপ্লবিক হত্যা বা ডাকাতির জন্য তাঁহার নির্মল চরিত্রে কোন দোষ বা নিন্দা অর্শিতে পারে না। স্বাধীনতা-অর্জনের পথ চিরদিনই রক্তাক্ত। যে দেশেই স্বাধীনতার সূর্যোদয় হইয়াছে, দেশের রক্ত-গঙ্গার বক্ষ হইতেই তাহা প্রথম দেখা দিয়াছে। অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত মহাত্মা গান্ধীর অভিনব বিপ্লব-প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার বর্তমান উদয়-পথেও অন্তর্বিপ্লবের রক্তধারা ছুটিয়াছে ও দেশকে ভয়াবহরূপে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথকে বিদেশী শাসক রাজদ্রোহী ও অপরাধী বলিয়া গাঢ় কালিমা লেপন করিলেও দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আলোকে তাঁহার জীবন উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইবে। নিজের দেশকে ভালবাসিবার জন্য কেহ অপরাধী হইতে পারে না। দেশপ্রেম অপরাধ নহে, বৈদেশিক শাসনশক্তি তাহাকে যে চক্ষেই দেখুক না কেন, দেশপ্রেমই মানুষের জীবনকে সার্থক করিয়া থাকে। আলিপুর বোমার মোকর্দমায় অভিযুক্ত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ঐ মোকর্দমা চলিবার সময়ে আদালত-গৃহেই গান করিয়াছিলেন—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথ স্বার্থত্যাগী আত্মবিলোপী দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশকে স্বাধীন করিবার জ্বলন্ত আগ্রহ আজীবন বুকের মধ্যে প্রজ্জ্বালিত রাখিয়া তাহার বহ্নিশিখায় নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার স্নেহ-ভালবাসা—সর্বস্ব আহুতি দিয়া একনিষ্ঠভাবে দেশের কর্ম করিয়া গিয়াছেন। মানুষ মাত্রেই—বিশেষত পরিবারিক সুখপ্রিয় বাঙ্গালী জীবনের মায়ায় অভিভূত। যতীন্দ্রনাথ সেই মায়া অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়াছিলেন। গীতার নিষ্কাম ধর্ম বর্ণে বর্ণে অন্তরে পোষণ করিয়া তাহার দ্বারাই তিনি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। গীতার নিষ্কাম ধর্মেরই তিনি প্রতীক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গী বিপ্লবী কর্মিগণ সকলেই গীতোক্ত ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশপ্রেমে মাতিয়াছিলেন। এই সকল স্বার্থশূন্য আত্মবিলোপী জীবনকে লক্ষ্য করিয়া বিদেশী বিচারকগণ অনেক কটূক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের একজন মহামতি হাইকোর্টের বিচারপতিও এক বোমার মোকর্দমায় রায় দিয়াছিলেন—'ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার ধর্মমতগুলিকে প্রতারক ষড়যন্ত্রকারীরা দুর্বল-মতি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবার ও ভুলাইবার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিত,'—ইহাতে মনে হয়, দেশের এই সকল বিপ্লবী অন্তরে কি মহৎ ভাব ও অনুপ্রেরণা লইয়া সাধারণ পাপ-পুণ্য জ্ঞানের অতীত হইয়া কর্ম করিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি আদৌ উপলব্ধি করেন নাই। বিপ্লবের কঠিন পথে দাঁড়াইয়া যতীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠিত কর্মসকল প্রচলিত আইনের চক্ষে যত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন, দেশের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যেই যতীন্দ্রনাথ মনে কোনরূপ কোমল বৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়া, কার্য সাধন করিব অথবা মরিব—এই কঠোর সঙ্কল্প ও অমোঘ লক্ষ্য লইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। যাহারা দেশকে পরাধীনতার নিগড়ে বাঁধিয়াছিল ও দিন দিন সে বাঁধন কঠিন করিয়া

তুলিতেছিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জগতের অসাধারণ মহান ব্যক্তি যে প্রশংসা পূজা ও সম্মান পাইবার যোগ্য, যতীন্দ্রনাথ তাঁহার উত্তরপুরুষের নিকট হইতে তাহা পূর্ণরূপে পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতে ব্যক্তিগত সাহস ও শক্তির চাইতে অধিক প্রশংসনীয় আর কিছু নাই। যতীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতিদত্ত সাহস শক্তি ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিলেন এবং অমানুষিক তেজে ও ক্ষমতায় ভূষিত ছিলেন। ঐ মানসিক তেজ ও শৌর্যবীর্যের কারণেই তিনি সাধারণ ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁহার ঐ শক্তি, সাহস ও উৎসাহ তাঁহার জীবনকে অলৌকিক-রূপে পরিচালিত করিয়াছে। তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা সারারণ লোকের মনঃপূত না হইতে পারে, তাঁহার কর্মপথ সাধারণ জনগণের পথ না হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মুক্তি কামনায় তাঁহার অভূতপূর্ব একনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও আগ্রহ, অকপট সাধনা ও কর্ম উপেক্ষা ও সন্দেহ করিবার নহে, তাহার আদর্শ সর্বথা অনুকরণীয়। যে উচ্চ আশা লইয়া তিনি জীবনে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সাধারণ লোকে ঘরে বসিয়া সে চেষ্টাকে পাগলামি বলিয়া সমালোচনা করিতে পারে। অসাধারণ ব্যক্তি মাত্রেরই জীবন কোন না কোন পাগলামির প্রেরণায় পরিচালিত। সেই পাগলামি সফলতা লাভ করিলে সেই মানুষই তখন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন. —ইহাই জগতের নিয়ম। জগতে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দশজন মাত্র অসাধারণ আর সেই দশজনের মধ্যে হয়তো একজনের জীবনে তাঁহার তথাকথিত পাগলামির সফলতা আসিয়া দেখা দেয়। যতীন্দ্রনাথ লক্ষ্যসাধনায় সেই সময় বিফলমনোরথ হইলেও আপাত

দৃষ্টিতে তাহা তাঁহার পরাজয় বলিয়া মনে হইলেও, তাহাই তাঁহার জীবনের চিরন্তন জয়।

যতীন্দ্রনাথ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে দৃপ্ত শক্তি লইয়া ছুটিয়াছিলেন, আর সেই স্বপ্ন ও আদর্শের জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। এ-জগতে তাহা কয়জন করিতে পারে? নিজের আদর্শে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে—প্রাণে উন্মাদনা আছে—একমাত্র তিনিই পারেন। দেশের জন্য মরিতে বলিলেই সাধারণ দুর্বল মানুষ সে আদর্শের জন্য মরণের পথে অগ্রসর হয় না।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতদিন পরে এখন দেশের ভাগ্যে শুভ-মুহূর্ত আসিয়াছে, সমগ্র জাতি ও জনগণের চিত্তে তাঁহার সে স্বপ্ন আত্মপ্রকাশ করিতে ও বাস্তবে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন লইয়া তিনি যে যে কর্মসাধন ও আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন আজ তাহার সফলতা কামনা করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে তাঁহার জীবনের এই বিপ্লবকাহিনীর অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

যতীন্দ্রনাথ যে বিপ্লব-আদর্শ ও বিপ্লবপন্থার সেবা করিয়া গিয়াছেন, সকল দেশেরই মুক্তি আন্দোলনের একটা পর্যায়ে উহা দেখা দিয়া থাকে এবং সেই পর্যায়ের অবসানে সেই আদর্শ ও পথ অন্য আদর্শ ও পথে রূপান্তর লাভ করে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই তাহা ঘটিয়া থাকে; বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমাদিগের দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম পর্বে যে পথে যে আদর্শে বাংলার শিক্ষাদীক্ষা সাধনাসংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, তাহার ফলে অঘোরপন্থী বিপ্লবান্দোলন খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা

দিয়াছিল। ভাল লাগা বা মন্দ লাগার কথা নয়, সে প্রশ্ন অবান্তর—শুধু জানিবার কথা এইটুকু যে কার্যকারণ সম্বন্ধগত ঐতিহাসিক নিয়মেই তাহা ঘটিয়াছিল এবং আজ ঐতিহাসিক কারণেই তাহার বিলয় ঘটিয়াছে।

কোন মুক্তি-আন্দোলনই কখনও একেবারে নিরর্থক হয় না, বাংলার বিপ্লবান্দোলনও হয় নাই। এই আন্দোলন শক্তি ও নিষ্কাম কর্মযোগের উপর যে জীবন-দর্শন রচনা করিয়াছিল, বাংলার ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই পর্বে সে জীবন-দর্শনের সার্থকতা অনস্বীকার্য। সেই ব্যক্তিগত চরিত্রাদর্শের সার্থকতা আজিও রহিয়াছে। দেশ আজ যে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহার পিছনে সেদিনকার ত্যাগ ও বীর্য, সেবা ও নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও নির্ভীকতা রহিয়াছে।

দেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আজ যে অন্য আদর্শ ও পন্থা রচনা করিয়াছে। তাহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত ইহা নয় যে, অঘোরপন্থী বিপ্লবীরা অন্যায় বা অধর্মাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশ আজ ভিন্ন আদর্শ ও পথ গ্রহণ করিয়াছে। সেদিনকার বিপ্লবান্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর যুবকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, একথা গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে। তাহাদিগের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে গণচেতনার যোগ ছিল না। তাহা ছাড়া সেদিনকার বিপ্লবাদর্শের মূল প্রেরণা ছিল উচ্চস্তরের হিন্দুসাধনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা দীক্ষা সাধনা সংস্কৃতির ফলে দেশে আজ একটী নূতন মানসাকাশ রচিত হইয়াছে, নূতন একটী দৃষ্টি ও চিন্তার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার ফলে দেশের বিপ্লবাদর্শ এবং বিপ্লবপন্থাও বদলাইয়া গিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বুদ্ধিতে আজ গণচেতনা আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এবং

ভারতবর্ষের সাধনা ও সংস্কৃতি, চিন্তা ও ধ্যান যে একান্তভাবে উচ্চস্তরের হিন্দুরই নয়, নিম্নস্তরের হিন্দু ও মুসলমানেরাও যে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, এখন এ বোধ আমাদিগের মধ্যে জাগিয়াছে। তাহার ফলে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কয়েকটী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের গোপন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছে, অঘোরপন্থাও সেই জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির বিকাশ এবং ব্যক্তির বিনাশ, সেই ব্যক্তি-আদর্শও সমষ্টিগত আদর্শে বিবর্তিত হইয়াছে। সেই জন্য দেশ আজ বিশ্বাস করে না যে কোন একটী বিশেষ যন্ত্রীর জীবনের অবসান ঘটাইলেই মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়; সেই যন্ত্রী ও যন্ত্রের পিছনে যে সমষ্টিমানস সক্রিয়, যে চিন্তাধারা সক্রিয়—তাহাকেই বিনাশ করিতে হয়। যে গণচেতনার কথা বলিয়াছি এই গণচেতনার মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা তো আছেই—কিন্তু আরো আছে দৈনন্দিন বস্তু-পৃথিবীর প্রয়োজনগত প্রেরণা, যে প্রেরণা প্রধানত অর্থনৈতিক। অঘোরপন্থী বিপ্লবান্দোলনে সে প্রেরণা ছিল না; এই কারণেই অঘোরপন্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইতিহাস কোথাও আসিয়া বসিয়া থাকে না—সে অগ্রসর হইয়াই চলে। একদিন যে পথকে একান্ত ও সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, পরের দিন সে পথ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—পায়ের নীচে নূতন পথ দেখা দেয়। পিছনে পড়িয়া-থাকা পদচিহ্নগুলিকে তবু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা ধরিয়া রাখি—ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিতের জন্য, নিজেদের চিত্তে প্রেরণা-সঞ্চারের জন্য। যতীন্দ্রনাথ তেমনই একটী পশ্চাতের পদচিহ্ন।

সেই পদচিহ্নের পাশে পাশে আগে ও পরে অনেকের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সকলের পদবিক্ষেপে একটা পথ একদা রচিত হইয়াছিল। সে পথও আমাদের পিছনে পড়িয়া রহিল—আমরা আজ নূতন পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।

যতীন্দ্রনাথ নিজের নামের বানান করিতেন—জ্যোতিন্দ্রনাথ কিন্তু বইয়ে আমরা প্রচলিত বানানই রাখিয়াছি।